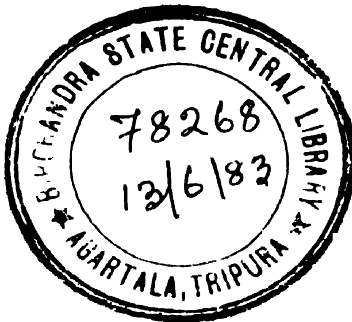
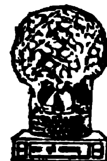
আয়না

পি. কেশবদেব

অনুবাদ

চন্দনা দত্ত





ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

Rs. 9·25

Original Title : KANNADĪ
Bengali Translation : AYENA

নির্দেশক, ন্যাশানাল বুক ট্রাষ্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি- 110016
কর্তৃক প্রকাশিত এবং নবজীবন প্রেস, কলিকাতা- 700006 থেকে মুদ্রিত

ভূমিকা

শ্রী পি. কেশবদেব মলয়ালম ভাষার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কন্নাড়ি (আয়না) উপন্যাসের ভূমিকা লেখার সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। কেননা ভূমিকা ও ভূমিকা লেখকদের সম্বন্ধে কেশবদেব খুব আস্থাবান নন। তাঁর মতে আদৌ ভূমিকা লেখার কেউ যদি যোগ্য হন তা সে লেখক স্বয়ং। তাঁর বিশ্বাস, সমালোচনা সৃষ্টিধর্মী লেখার অনুকূল নয়। তবু তাঁর উপন্যাসের ভূমিকা লেখার এ সুযোগ লাভে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। তবে আমি এও না বলে পারছি না যে, তাকাড়ীর 'এনিপ্পডিকল', এম. টি. বাসুদেবন নায়ারের 'নালুকেটট্টু', পারপ্পুরত্তুর 'অয়নাড়িগ নেরম' ইত্যাদি রচনার মত কেশবদেবের এই রচনাটি অন্যভাষায় অনুবাদের অনুকূল নয়। তাঁর 'অয়লক্কার' অথবা 'ওড়িয়ল নিন্নু' অন্য ভাষায় অনুবাদ করা চলতে পারে। এ দুটি রচনাই কেশবদেবের বহুমুখী প্রতিভার পরিচায়ক। 'আরাকল', 'কন্নাড়ি' তাঁর সাহিত্যসাধনার পরিচয় চিহ্নমাত্র। তার মানে এ নয় যে এ-রচনায় কেশবদেবের প্রতিভার কোন ছাপ নেই। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই উপন্যাস কেশবদেবের বহুমুখী প্রতিভার পূর্ণ পরিচায়ক নয়। হয়ত কোন আইনগত বাধা থাকায় ন্যাশন্যাল বুক ট্রাষ্ট ইণ্ডিয়া, তাঁর অন্য সাহিত্যকর্ম নির্বাচনে অসমর্থ হয়েছেন।

নল্লেডত্তু পদ্মনাভ পিল্লে, কেশবদেব পিল্লে এবং পরবর্তীকালে পরিচিত কেশবদেব 1904 সালের আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন (কথাটা খোলাখুলি বলায় আশাকরি কেশবদেবমশাই আমার

ওপর বিরক্ত হবেন না)। নল্লেডত্তু পদ্মনাভ পিল্লাই কেশবদেব পিল্লের পরই কেশবদেব হয়ে গেলেন।

এর পেছনেও একটা মজার গল্প আছে। আঠারো বছর বয়সে কেশবদেব আর্যসমাজে যোগ দেন। সমাজের অনাচার ও দুর্নীতির সংগ্রামের অদম্য ইচ্ছা তাঁকে এমন সিদ্ধান্তে আসার প্রেরণা দিয়েছিল। আর্যসমাজে যোগ দেওয়ার সময় সদস্যদের নতুন নামকরণের রীতি প্রচলিত। তাই সংস্থার কর্মকর্তা ঋষিরাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "দেব কিংবা দাস কোনটা হবার ইচ্ছা?" উত্তরে কেশবদেব বলেছিলেন, "আমি তো দেবই হ'তে চাই, দাস হ'তে আর কে চায়?"

ঘটনাটা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে এতে কেশবদেবের জীবন এবং সাহিত্য-সাধনার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। কেশবদেব বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের নেতা। তাঁর মতে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদই প্রধান কর্তব্য। গোড়ায় যিনি কেরলে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রবক্তা ছিলেন, সেই কেশবদেবই পরে বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করার বিরুদ্ধে এককালে যিনি ছিলেন সোচ্চার, সেই কেশবদেবই পরে কেন্দ্রীয় সাহিত্য অকাদেমীর পুরস্কার গ্রহণ করেন। শুধু সমালোচনার ক্ষেত্রেই তাঁর মত পরিবর্তন হয়নি। প্রথম থেকেই তিনি সমালোচকদের বিপক্ষে এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর মতামত অপরিবর্তিত।

মলয়ালম সাহিত্যে কেশবদেবের স্থান কোথায়, এ নিয়ে আলোচনা করতে হলে মলয়ালম উপন্যাসের ইতিবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে করাই যুক্তিযুক্ত। ভারতবর্ষের উপন্যাসের ইতিহাস 175 বছরের মত, মলয়ালমে সেটা তারও আধাআধি সময়ের। 1801 সালে বাংলায় প্রকাশিত 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'কেই প্রথম ভারতীয় উপন্যাস বলে ধরা হয়। বাংলায় যে গদ্যসাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত তা ক্রমে হিন্দী, উর্দু, মারাঠী ভাষায় পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তার প্রসার হয়েছিল খুবই মৃদুমন্থর গতিতে। তামিল ভাষায় বাইবেল অনূদিত হয় 1873 সালে, কিন্তু প্রথম উপন্যাস রচিত হয় 1880 সালে। কারণ তামিল ভাষায় কাব্য বা পদ্য সম্বন্ধে দৃঢ় রক্ষণশীল মনোভাব দেখা যায়। কেরলে উপন্যাস রচিত হয় আরো পরে। জোয়ারত্তু চন্তু মেনন যখন 'ইন্দুলেখা' রচনা করলেন তখন মলয়ালম সাহিত্যে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হ'ল বলা যায়। একথা আরও স্মরণীয় এই কারণে যে চন্তু মেনন 'ইন্দুলেখা'র প্রেরণা ডিজরেলীর 'বান্টিটা টেম্পল' থেকে পান। তারপর স্যার ওয়াল্টার স্কটের 'আইভান হো' দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সি. ভি. রমন পিল্লাই লিখলেন 'মার্তণ্ডবর্মা'। তাই মলায়ালম ভাষায় গদ্যসাহিত্যের ধারা ইংরাজীর অনুকরণেই আরম্ভ হয়।

ইংরাজী সাহিত্যের মতই মলয়ালম সাহিত্যে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, আলোচনা, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি রচনার সন্ধান পাওয়া যাবে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য সর্বপ্রকার সাহিত্যরচনার যথাযথ প্রতিশব্দ বা নাম থাকলেও উপন্যাসের কোন প্রতিশব্দ নেই মলয়ালম ভাষায়, তাই নভেল শব্দটাই প্রচলিত, 'আখ্যায়িকা' কথাটা তো বিলুপ্তই বলা চলে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে চন্তু মেনন ও সি. বি. রমন পিল্লাইয়ের আবির্ভাব হলেও, এরপর প্রায় ত্রিশবছর উপন্যাস লেখায় ভাঁটা পড়ে যায়। একথা সকলেই স্বীকার করেন, ইংরেজী সাহিত্যের লক্ষ্যাভিমুখী কেরলীয় লেখকদের বিশ্বসাহিত্যের উর্বরা ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রথম কৃতিত্ব শ্রী বালকৃষ্ণ পিল্লাই কেশরীর। য়ুরোপীয় সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান থাকায় তিনি নবীন লেখকদের শিক্ষক, বন্ধু ও পথপ্রদর্শক হয়ে উঠলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের উৎকৃষ্ট কিছু নিদর্শনের সঙ্গে তিনি কেরলবাসীদের পরিচিত করিয়েছিলেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া

তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নবীন লেখকরা সাহিত্যসৃষ্টিতে নতুন শৈলী সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

মলয়ালম সাহিত্যে এই সময়ে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার কারণ বহুমুখী। 1937 সালের গোড়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন নেতাদের হাতের মুঠোয় এসে যায়। বামপন্থী চিন্তাধারা, বিশেষ করে মার্কসবাদ ও কম্যুনিজম নবীন লেখকদের প্রভাবিত করতে আরম্ভ করে। এর আগে লেখকদের মূল সমস্যার রূপ ছিল ভিন্ন—যা মূলতঃ ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত, চিরাচরিত আচার-ব্যবস্থার এবং পশ্চিমী সভ্যতার সংঘর্ষ। এঁদের সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু ছিল মধ্যবিত্তের স্বপ্নিল দৃষ্টিকোণ ও আদর্শ প্রেম। কিন্তু নবীন প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠী, সমাজের অর্থনৈতিক দূরবস্থা, দুর্ভোগ, শোষণ, নির্যাতন ইত্যাদি সমস্যাকেই সাহিত্যের মুখ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এঁদের নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কেশবদেব।

কেশবদেবের একটা আত্মাভিমান আছে যে, তিনি সাহিত্যকে উচ্চ ও মধ্যবিত্তের আসর থেকে গরীবের কুটিরে স্থানান্তরের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, তিনিই সর্বপ্রথম মলয়ালম সাহিত্যে জীবনের সামগ্রিক রূপের প্রসঙ্গ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। তিনি একথাও জোর দিয়ে বলেন যে অন্য আর কেউ এত ব্যাপকভাবে জীবনের সর্বস্তরে ছবি আঁকতে সমর্থ হননি। অবশ্য একথাও সত্যি যে তিনি অন্ততঃ পঁচিশখানা উপন্যাস, পনেরোটি গল্পসংগ্রহ, এগারোখানা নাটক, সাতটি একাঙ্কিকা সংকলন, চার খণ্ডের আত্মজীবনী, একখানা প্রবন্ধালোচনা রচনা করেছেন এবং এত অধিক পরিমাণে লিখতে পারার প্রশ্ন শুধু মলয়ালমেই নয়, অন্য যে কোন ভাষাতেও বিরল। সাহিত্যের একটা শাখাই কেশবদেবের অস্পৃশ্য রয়ে গেছে—সেটা কবিতা।

মলয়ালম সাহিত্যে সর্বহারাদের প্রথম লেখক হিসাবে কেশবদেবের নাম করা চলে। অবশ্য তার মানে এই নয়, যে আরো সার্থক লেখক শ্রীতাকাড়ী শিবশঙ্কর পিল্লাই এই তালিকা থেকে বাতিল হয়ে যাচ্ছেন। আমি বলতে চাইছি, 'স্যোসালিস্ট' সংস্থাসমূহের সংগঠন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন কেশবদেব এবং সেখান থেকেই প্রেরণা লাভ করে সাহিত্য রচনা করেছেন, ধনী-নির্ধনের শ্রেণীসম্পর্ককে এবং তার অনিবার্য সংঘর্ষের ঘটনাধারাকে উপলব্ধি করে তারই চিত্র এঁকেছেন। কেরলের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেশবদেব। তখনই তিনি কোচিন এবং আলুপ্পুরার শ্রমিকদের সংগঠিত করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে তাদের অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। একদিকে আমরা তাকাড়ী শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের রচনায় সামাজিক অবস্থার শৈল্পিক প্রকাশ দেখি, অন্যদিকে কেশবদেবের বেলায় মেলে তার সামগ্রিক প্রতিফলন। তাকাড়ী যখন নিজের অনুভূতি ও দৃষ্টিকোণের শিল্পসম্মত ছবি আঁকেন, কেশবদেব তখন সামগ্রিক চেতনাকে প্রাধান্য দেন।

তাঁর সমস্যা সাহিত্য নয়, জীবন—এ মনোভাব কেশবদেব কখনই গোপন রাখেননি। শুধু তাই নয়, যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখন একথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। 'কন্নাড়ির' ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"আমি যা লিখছি কোনও সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, সাহিত্যিক হওয়ার কোনও অভিলাষ নিয়েও নয়। সাহিত্য আদৌ কোন প্রশ্ন নয় আমার কাছে। আমার সামনে যে প্রশ্ন, সেটা জীবনের। আমি জীবনের সমালোচক, তার ব্যাখ্যাকার। নিজের আলোচনাও ব্যাখ্যা যখন উপস্থাপন করি তখন সেটাই সাহিত্য হয়ে ওঠে।" এই পংক্তিটির লেখকের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিলো তখন তিনি পুনরুক্তি করলেন—"সাহিত্য আমার কাছে বড় প্রশ্ন নয়, আমার যে প্রশ্ন তা জীবন নিয়ে। জীবনের সুখবৃদ্ধি, দুঃখের বিলোপ

সাধন—এই আমার চরম লক্ষ্য। তাই লিখতে হয়, তাই বক্তৃতা করি। আমি উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য করি : সমাজের সঙ্গে আমার সম্পর্কই আমার লেখার প্রেরণা।”

কেশবদেব সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যবাদী সাহিত্যিক। জীবনের সামগ্রিক পরিবর্তন-সাধনের লক্ষ্য ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি লেখেন না। বস্তুতঃ সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর একমাত্র সংকল্প নিয়েই তাঁর সাহিত্যচর্চা। এই জীবনের চেহারা নিয়ে যে প্রশ্ন তাঁর সামনে তার সমাধান করবার জন্যই তিনি বক্তৃতা করেন, লেখেন, যৌথকার্যক্রমের কর্মকর্তা হন এবং অনুরূপভাবে নিজের জীবন যাপনও করেন। কখনও মনে হয় না সাহিত্যের কোন বিশেষ রূপ বা শাখার প্রতি তাঁর পৃথক একটা মমত্ববোধ রয়েছে। নিজের বক্তব্য স্বচ্ছ করতে যে ধারা বা ভঙ্গী তাঁর উপযুক্ত মনে হয়, তাই গ্রহণ করেন। নাটক, উপন্যাস, গল্প, একাঙ্কিকা, প্রবন্ধ, সর্বক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তবে অন্তিম লক্ষ্য দৃঢ় হওয়ায় নিজের পক্ষপাতের ব্যাপারটাকে কখনই গোপন রাখেন না। উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে যদি শৈল্পিক ব্যঞ্জনার পরিবর্তে স্পষ্টভাবে বলার দরকার হয় তা গ্রহণ করতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না। খুবই আশ্চর্যের কথা যে, জীবনের প্রেমিক হওয়া সত্বেও প্রেম-ভালবাসার প্রসঙ্গে তাঁর তিক্ততা প্রকাশ পায়।

অত্যাচারিত নিপীড়িতের স্বপক্ষে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন কেশবদেব। ‘রিয়ালিজম’ শৈলীকেই গ্রহণ করেছিলেন। মলয়ালমে বাস্তববাদের সূত্রপাতকারীদের তিনি ছিলেন অন্যতম। পরে প্রগতিমূলক সাহিত্যধারার সূত্রপাতও করেন তকালি এবং দেব। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আমি পোনকুন্নম বর্কী, বৈক্কম মুহম্মদ বশীর, এম. পি. পোল প্রভৃতি লেখকদের বিস্মৃত হইনি। আমার বলার অর্থ এই যে, সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনতাকে প্রতিবাদী করে তোলার আন্দোলনে অগ্রণী পতাকাধারী ছিলেন দেব।

যদিও আমি বলেছি যে কেশবদেব কট্টর বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল, তবু একথা সত্যি যে তিনি পুরোদস্তুর রোমান্টিক। উদাহরণ হিসেবে 'ওড়িয়ল্ল নিন্নু' (নোংরা জলের কল থেকে) নেওয়া যেতে পারে। 1912 সালে রচিত এই উপন্যাসটি পপ্পু (পদ্মনাভন) নামের এক রিক্সাওয়ালার ত্যাগ, একনিষ্ঠা আর মনুষ্যত্বের কাহিনী। কার্যযাতনার অকুল পাথারে পড়েও লাঞ্ছিত মানুষও যে মহত্তর আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে পারে দেব এ তথ্য পরিবেশন করেছেন তাঁর এ রচনায়। এ সত্যকে যথাযথ খুঁজে পাওয়ায় সফলও হয়েছেন তিনি এবং একথাও সত্য যে এ রচনায় তাঁর রিয়ালিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গীও মাথা চাড়া দিয়েছে বারবার। নোংরা জলের ধারা থেকে যে গরীব মেয়েটিকে পপ্পু উদ্ধার করলো, সে-ই ভালবাসল এক ধনীকে, এতে কি সেই পুরাণো সিণ্ডেরেলার গল্পের ছায়া খুঁজে পাওয়া যায় না? এভাবে পপ্পুর চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে অতিমাত্রায় ভাবালুতা খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে। আত্মাভিমান ও ঔজ্জ্বল্যের মূর্ত প্রতীক পপ্পু আদর্শবাদীর অলিগলিতে দেখতে পাওয়া সাধারণ রিক্সাওয়ালা মাত্র নয়। আসলে কেশবদেব পপ্পুর জীবনের তাৎপর্য নোংরা জল থেকে অনেক উচু আরেক আদর্শে স্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। কেবল 'ওভিয়ল নিন্নু' উপন্যাসে নয়, এমনকি 'এক সুন্দরীর কথা', 'স্বপ্ন' প্রভৃতি রচনাতেও চিন্তার এই গভীর ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। তবে এসবই কেশবদেবের মনোবাসনা এবং এক অনুপলব্ধ জীবনের আবিষ্কার। তা যাই হোক, একথা বলতেই হবে যে কেশবদেবের লেখায় এই অতি-ভাবুকতা প্রায়ই তাঁর প্রবল যাথার্থ্যবোধের উপর গভীর ছায়াপাত করেছে।

জীর্ণ পুরাতনকে উৎখাত করবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন বলেই দাবী করেন দেব। একথা সত্য। তবে একই সঙ্গে তিনি প্রাচীন আদর্শে বিশ্বাসীও বটে। তাঁর বিশ্বাস যে তাঁর ভালবাসার

পাত্র সর্বদা সদাচারে আস্থাবান। সৎপথে চলার পরম প্রত্যয় পন্নুর জীবনে স্পষ্টরূপেই প্রতিভাত। সেরকমই 'এক সুন্দরীর কথা'র জীবনীও। স্বীয় চরিত্র থেকে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট না হয়েও সমাজের শীর্ষস্থলে পৌঁছান যায়। বলা যেতে পারে যে দেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'রৌডি' (গুণ্ডা)—যে গুণ্ডা বদমাইসের রাজকুমার। যে মুহূর্তে হিংসার প্রতীক ছোরাটা সে ফেলে দিচ্ছে তখনই সে জীবনের সঙ্গে, ধর্মবোধের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে।

অবশ্য একথা মানতে হবে যে যাথার্থ্যবোধ আর ধর্মবুদ্ধির সংঘাতের ফলে দেবের কোনো কোনো লেখা শিল্পসৌকর্যের দৃষ্টিতে অপরিণত। দেব আর তাকাড়ীর সাহিত্যবোধের তফাৎটুকু এখানেই। মাত্র 'চেম্মিন' উপন্যাসেই তাকাড়ী রোমান্টিকের সাজে সজ্জিত। বাদবাকী প্রায় সব লেখাতেই তিনি বাস্তববাদী হিসেবে দেবকেও ছাড়িয়ে গেছেন। যদি আমরা কল্পনা করে নিই যে কেশবদেবের পরিবর্তে তাকাড়ীই 'ওডিয়ল নিন্নু' রচনা করেছেন তাহ'লে উল্লেখিত তফাৎটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। তাকাড়ীর মানসপুত্র হলে পপ্পু জীবনের ক্রূরনীতির পাঁকে পড়ে পালিতা কন্যায় মোহিত হয়ে অন্ন সংস্থান করতো আর গলিতেই হারিয়ে যেত। তাহলে হয়তো তাকড়ীর এই 'ওডিয়ল নিন্নু' কলাসৌকর্যে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হত। কিন্তু দেবের সেই সমাজচিন্তা কখনও তাতে পাওয়া যেত না কিংবা সাধারণ মানুষের সুখবৃদ্ধি বা দুঃখলাঘবের আত্মবিশ্বাস লাগাতে ততখানি সফল হত না। দেবের চরম লক্ষ্য আর তাকাড়ীর শিল্পবোধের তফাৎটা এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

মোটামুটিভাবে কেশবদেবের রচনা দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—রোমান্টিক আর রিয়ালিস্টিক। তবে এই শ্রেণীবিভাগ আবার খানিকটা অযৌক্তিকও বটে, কারণ কোনো কোনো উপন্যাসে এই দুই শ্রেণীর মিশ্রণও পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে 'ওডিয়ল

নিন্নু', 'এক সুন্দরীর কাহিনী', 'স্বপ্ন', 'প্রেমসূর্য' ইত্যাদি পড়লে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসে 'অয়লক্কার' (প্রতিবেশী), 'কন্নাড়ি', 'অধিকার' 'কার জন্য', 'কোন পথে'। কেশবদেব বিপ্লবী ও প্রচারমূলক লেখক হিসাবে জীবন শুরু করেন। তাই তিনি পাঠকের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট।

'কার জন্য', 'কোন পথে' উপন্যাসসমূহে প্রতীকের ব্যবহার পাঠকের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। চলতি সরল শব্দের প্রয়োগে মানুষের মনে তুফান জাগানোর মতো দেবের রচনাশৈলী অন্যদের মনে ঈর্ষা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। জীবনের সব সাধারণ ঘটনা যখন দু'চার কথার মধ্যে বর্ণনা করেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এ-ও উল্লেখযোগ্য যে জীবনের কাব্যসুষমা অনুসন্ধানেও তিনি প্রবীণ।

উচ্চাদর্শের সমাজবোধসম্পন্ন লেখক কেশবদেব। স্বীয় কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় বর্ণনার সঙ্গে সে সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করার ব্যাপারেও তিনি পেছপা নন। যেহেতু দেব নিজেই সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি, তাই এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। তিনি একে আপন শক্তির অঙ্গ বলেই মনে করেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবে এটা তাঁর শক্তি, কিন্তু শিল্প সৃষ্টির প্রসঙ্গে সেটা আবার তাঁর দুর্বলতা বলে প্রতিভাত হয় না ত? উদাহরণ হিসাবে 'অয়লক্কার' (প্রতিবেশী) বিচার করা চলে। 1913 সালে লিখিত এই উপন্যাস কেন্দ্রীয় সাহিত্য অকাদেমী দ্বারা পুরস্কৃত হয়। কেরলের সমাজ-জীবনের বিবিধ পরিবর্তনের ইতিবৃত্তের গভীরতা এই উপন্যাসে বর্ণিত। এতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক সংঘাতের সঙ্গে কেরলের পরিচিত হওয়ার এক মনোহর চিত্রও দেখা যায়। এই সাহিত্যকর্মে ত্রুটিহীন ইতিহাসবোধ, যাথার্থ্যবোধ, সামগ্রিকদৃষ্টি আর সপ্রেম নীতিবোধ দ্বারাই দেব চালিত হয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকটি চরিত্রকে পৃথকভাবে

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে ব্যক্তি-চরিত্রের চেয়ে সমাজ বা বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। রক্তমাংসে জড়িত সংকীর্ণতা ও বিরুদ্ধাচরণপুষ্ট চরিত্র এরা নয়। এরা যেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নিছক প্রতিনিধি। সহজ ব্যক্তি-রূপের গভীরতা এতে বেশী ফোটেনি। যদিও জীবন থেকে চরিত্র নির্বাচন করেছেন, কিন্তু তাতে সংকীর্ণতা বর্জন করে এবং সমতা রক্ষা করে তিনি নিজের মতো করে তা সৃষ্টি করেন। প্রধানত তা হয় আশার প্রতীক। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে জীবনের প্রতিনিধি তিনি, তবে প্রতীক ঠিক ততটা নন।

আসলে নিজের ভিতরকার রোমান্টিক আর বাস্তববাদী চেতনার সংঘাতের ফলই কেশবদেবের রচনা। তারই মধ্যে সংঘাতের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রতিরূপ খুঁজে পেতে পারি। যদিও দেবের বয়স আজ সত্তর পেরিয়েছে, তাঁর মধ্যেকার বিপ্লবী এখনও নিশ্চুপ বসে থাকতে নারাজ। শব্দের কোমল অনুরণনে যে ক্ষেত্রে মৃদুমধুর সঙ্গীত মূর্ছনা আনা সম্ভব, সেখানেও তিনি উগ্রশব্দ বীরত্ব এবং উৎসাহব্যঞ্জক সংগ্রাম সঙ্গীতের পরিবেশনে ব্যাপৃত। লক্ষ্যে উগ্র হওয়ায় রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য থেকে চরিত্র নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে মঞ্চে নিজেই এসে অথবা চরিত্রের মুখ দিয়ে নিজেই কিছু বলার পক্ষপাতী। হয়তো ঠিক যে কোন চরিত্রই পুরোপুরি তাঁর প্রতিভূ নয়, আবার কেউ কেউ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে। 'অধিকারে'র রামু, 'উলক্কা' (চিল)-এর কোচ্চরপ্পন, 'কন্নাড়ি'র হবা 'ওডিয়ল নিন্নু'র পপ্পু—এদের সবার মধ্যেই কেশবদেব বর্তমান। সর্বদাই লেখকের সৃষ্ট চরিত্র তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু কেশবদেব সদাসর্বদা চরিত্রকে একান্তভাবে নিজের মুঠিতে রাখেন।

সামগ্রিক পরিবর্তনের চাইতে রাজনৈতিক সমালোচনায় বেশী বিশ্বাসী কেশবদেবের একটি বিখ্যাত রচনা হ'ল 'কার জন্য'। 1950 সালে রচিত এই উপন্যাসের দুটো অংশ আছে। একভাগ

ভূমিকা, অপরভাগ উপন্যাস। কৃষ্ণচৈতন্য প্রমুখ সমালোচকদের বক্তব্য যে শিল্পগুণমণ্ডিত ভূমিকার সুফলটুকু স্পষ্ট হয়ে গেছে সম্পূর্ণ উপন্যাসটা তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ফলে। কারণ উপন্যাসটি ভূমিকায় বর্ণিত সিদ্ধান্তেরই কাহিনীরূপ। এ বইয়ে প্রধান চরিত্র কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। দেব তাঁর 'কার জন্য' উপন্যাসে নিষ্ঠুর-হৃদয় আর অধিকারলোভী এবং দলকে স্বনিয়ন্ত্রণে রেখে তার সর্বনাশ করে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধিতে তৎপর এক নেতার চরিত্র চিত্রণ করেছেন। স্টালিনের আমলে রাশিয়ায় যে শোধননীতি চালু হয়েছিল তা থেকে এই নায়ক প্রেরণা পেয়েছিল। নাটকীয় চমক আনার চেষ্টা যে দেবের ছিল তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু লেখার সময় আবিষ্ট হয়ে পড়ার ফলে হয়ত আত্মসংযম নষ্ট হয়ে গেছে, এবং শিল্পসৌকর্যের প্রশ্ন ছেড়ে রাজনৈতিক লক্ষ্যই হয়ত কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছে। 'কার জন্য' পড়তে গিয়ে মনে হয় যেন সার্কাসের মাস্টার সার্কাসের জানোয়ার নিয়ে রিংয়ে খেলা দেখাচ্ছে আর খেলা দেখানোর আগে সে সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা করছে।

আমি 'কার জন্য' সম্পর্কে এত বিস্তারিতভাবে বলছি কারণ আলোচ্য 'আয়না'ও কেশবদেবের একই ধরণের রাজনৈতিক চর্চার ফলশ্রুতি। কারণ 'আয়না'তে লেখক সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন যখন মার্ক্সের 'দুনিয়ার মজদুর এক হও, শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই' বাণীর অনুরনণ করতে করতে, সমানাধিকারে সুন্দর এক সমাজ-জীবনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মৃত্যুর ভয় না করে আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক 'আয়না'-র কাহিনীকাল। তখন বা তার কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত হলেও এ উপন্যাস বৈপ্লবিক বলেই পরিগণিত হত এবং হয়ত একে সরকারী রাজদ্রোহী ছাপ দিয়ে বন্ধও করা হ'ত। কিন্তু 1911 সালে এই বই প্রকাশিত (হয়ত বা লিখিত)। তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কমে গেছে। ইতিহাসের বিশেষ কালের কাহিনীর পুনরাবিষ্কার

অতীতের থেকে প্রেরণা পেতে বর্তমান প্রচেষ্টার স্বরূপ নিরূপণে সাহায্য করে। কেশবদেব 'আয়না'তেও সেই সব ঘটনা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন যার ফল 1938 সালের আলপ্পুষ শহরের হত্যাকাণ্ড। এই সুবিদিত ঘটনার বর্ণনায় দেবের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া তা পাঠকের তরফে যদিনা মেলে, তার কারণও সময়ের ব্যবধান। 1930—40 লেখা হলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে উপন্যাসটি সফল বলে গণ্য হতে পারত। তাছাড়া সমকালের সঙ্গে আগামীদিনের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা থাকলেও এর রস বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মাত্র 1938—39 পর্যন্তই দেব পোঁছাতে পেরেছেন। তাই 'আয়না' সম্পর্কে বলা চলে যে এই রচনা অসময়ে লেখা।

দেব বলেছেন 'আয়না' এক স্মৃতিচারণ। চরিত্রদের মধ্যে প্রধান 'হবা'ই তার প্রতিভূ। জীবনের তাৎপর্য এ লেখায় একটা বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত মেলে। দেব সাধারণ শ্রমিক মজুরের জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত। তাই তাঁর অনুপ্রবেশ খুবই সহজ-সরল ব্যাপার। কিন্তু দীর্ঘ চৌদ্দমাস ধরে লেখা হলেও 'আয়না'য় গভীরতা আর ব্যাপ্তি ততটা আসেনি। যদিও সাধারণ জীবনের বৈচিত্র্য বর্ণনে সিদ্ধ দেবের কথন-কৌশলের ঝলকানি এখানে ওখানে মেলে, তবুও সব মিলিয়ে তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি এ উপন্যাস। মানুষ হিসাবে কোচ্চুরামন আর গৌরী নীলীর ব্যক্তি-চরিত্রের যে ছাপ পড়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে চরিত্রের মধ্যে তা আসেনি। এর কারণও রয়েছে। কোচ্চুরামন আর নীলী দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এ্যণ্টনী আর রোক্কি আশার পরিবর্তন ও বিবেচনাহীন আস্ফালনের প্রতীক। হবা সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি যে দেব এ চরিত্রকে রোমাণ্টিকতার রঙের ছাপে প্রায় অবিশ্বাস্য করে তুলেছেন। অজ্ঞাতকুলশীল হবা এখানে ওখানে সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায়, একটা শিশুর মতই সরল। হ্যাঁ, হবা নামটাতেই ত হাসির আভাষ

রয়েছে। রক্ত আর ঘাম ঝরানো, শোষণ পীড়নে অভ্যস্ত মানুষের মাঝখানে এমন একটা অদ্ভুত চরিত্র এনে হাজির করার ফলে উপন্যাসের পারিপার্শ্বিক, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বক্তব্যাংশের যথেষ্ট হানি হয়েছে। তার পরিবর্তে যদি দেব দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া কোন শ্রমিক নেতার বর্ণনা করতেন, তবে হয়তো 'আয়না' সত্যি সেকালের 'আয়না' হয়ে উঠতো। আজকের প্রেক্ষাপটে হবা নিতান্তই এক 'ক্যারিকেচার' হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবন্ত সব পাত্র-পাত্রীর মাঝখানে এসে পৌঁছেছে এক কার্টুন চরিত্র। এবং 'আয়না' তাই নিতান্তই মলিন আয়না।

তা সত্ত্বেও বলতে বাধা নেই যে কেশবদেব কেরলের শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা পর্বের ইতিহাস—আকার ছোট হলেও সুস্পষ্ট-ভাবেই চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মালিককে ভগবান মনে করত যে শ্রমিকরা তাদের ক্রমজাগরণ ও সংগঠিত হওয়া এবং সুসময়ের অপেক্ষা করা—এসব তথ্য দেব সহজভাবে এবং আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন।

এই লেখা বিশেষভাবে অকেরলীয় পাঠকবৃন্দকে কেরলের সমাজ-জীবনের ইতিহাসের একটা বিশেষ কালের সঙ্গে পরিচিত হতে প্রভূত সাহায্য করবে। পরে বর্কি এবং এলা হয়ে গেল যারা সেই কোচ্চুরামন আর গোরী নীলীকে স্নেহপ্রবণ কেরলীয় শ্রমিকের প্রতিনিধি হিসাবে সদাসর্বদাই উল্লেখ করা যেতে পারে। গোড়ার আমলের পুঁজিপতি হিসাবে বক্কচ্চন আর শঙ্করণ সাহেব তো ভিন্ন চিন্তাধারারই বাহক। শ্রমিক নেতৃবৃন্দের জন্য সম্পন্ন সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসা কমরেড নীলকণ্ঠন (দেব তাঁর দামী হাতঘড়ির উল্লেখ করতে ভোলেননি!) কেরলের সুপরিচিত ব্যক্তি।

প্রতিবাদ প্রতিরোধের নেতা কেশবদেবের আত্মজীবনীভিত্তিক তিনখণ্ডে প্রকাশিত গল্প-সংগ্রহের নামও 'প্রতিবাদ'। কেরলের সমাজ-জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এই প্রতিবাদ-মুখরতা। আর এই

বাদ-প্রতিবাদ ত' মালয়ালী চরিত্রের প্রধান অভিব্যক্তি। বাদ্-বিতণ্ডার কেন্দ্রস্থল হয়েও সাহিত্যিক হিসাবে জীবিতকালেই কেশবদেব পূর্ণ সম্মানলাভ করেছেন। কেশবদেব এবং কেরল-বাসীদের পক্ষে এ সম্মানের কথা।

বাদ্‌বিতণ্ডা যদি কেরলবাসীর জীবনের মুখ্য অভিব্যক্তি হয়, তবে প্রতিবাদ ব্যাপারটা কেশবদেবের প্রাণবায়ু। এও ঠিক যে সততই প্রতিবাদ তার কাছে নিছক প্রতিবাদের খাতিরেই প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। তবে আসলে এই প্রতিবাদ-মুখরতা তাঁর সাহিত্যস্থষ্টিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। যুবকদের লজ্জা দেবার মতো প্রাণোন্মাদনা আর বীরোচিত ভাব কেশবদেবের মধ্যে বর্তমান। সেই সঙ্গে তিনি জীবন-প্রেমিক আর সদা যুবক-ছাত্রও বটে। তাঁর জীবন সম্পর্কে অনুরাগ আর আস্থাই ভগ্নস্তূপের ওপর নতুন প্রাসাদ গড়ে তোলায় এবং নিজের ভাঙ্গাবাড়ীর সংস্কারে তাঁকে উৎসাহিত করেছে। নবীন লেখকদের প্রতি তাঁর বাণী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"লিখে যাও। আমার এটুকুই বলার আছে। লিখে যাও, লিখতে থাকো। তবে লিখতে হলে জীবনের পাঠ নেওয়া প্রয়োজন। তাই জীবন অধ্যয়নই মুখ্য হওয়া প্রয়োজন।"

কেশবদেব পুরোপুরিভাবে কেরলীয়; সন্দেহ হয় যে কেরল ব্যতিরেকে তিনি কিছু লিখেছেন কিনা। কেশবদেব লিখিত এই 'আয়না' কেরলবাসীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অন্যতম উদাহরণ। সহানুভূতিশীল পাঠকদের কাছে এ গ্রন্থ আমি সাদরে উপস্থিত করছি।

টি. এন. জয়চন্দ্রন

[1]

এ্যান্টনীর বাবা কোচ্চুরামন, কোচ্চুরামনের বাবা কোচ্চায়প্পন তাড়ি তৈরী করতো। গৌরীনীলীর বাপ কণ্টন[১] পুলয়ন কোদাল কোপানোর কাজে খুব ওস্তাদ।

কোচ্চায়প্পন ও কণ্টন বক্কচ্চনের[২] নারকেল বাগানের খাস প্রজা। দক্ষিণে কণ্টন পুলয়ন আর উত্তরে কোচ্চায়প্পন চোবন[৩] (ইষবন) এক চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও তারা পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বজায় রেখেই একরকম বসবাস করতো। দুজনের সীমানা বরাবর একটা ছিল জলের নালা।

কোচ্চায়প্পনের বড় ছেলে কোচ্চুরামন, বয়স চব্বিশের ওপর। থার্ড কি ফোর্থ ক্লাশ অবধি পড়েছে। শরীরের গড়ন বেশ আঁটসাট ও সুন্দর। গেঞ্জী গায়ে দিয়ে কোঁকড়ানো চুলটা ঠিক করে সে বেরোবার জন্য তৈরী। তাকে দেখবার আশায় গৌরীনীলী নিজেদের বাইরের উঠানে এসে দাঁড়ায়।

কোচ্চুরামন কোচ্চি (কোচিন) বন্দরের জাহাজের মাল খালাসের মাঝি! সে সময়ে কোচ্চিন বন্দরে জাহাজ এলে সেটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসা কিংবা পাড়ের কাছে আনা সম্ভব হ'ত না, মাল বোঝাই সব জাহাজই দূরে সমুদ্রে নোঙ্গর ফেলতো।

১। কেরালার অন্ত্যজ জাতি।

২। কোনও এক খৃস্টানের নাম।

৩। চৌবন এক অন্ত্যজ জাতির নাম। এদের ইষবন বা তীয়ন বলা হয়। চৌবনেরা নিজেদের পুলয়ানদের চেয়ে উচ্চতর মনে করে। দুই জাতির মধ্যে পানাহার বা বিবাহ নিষিদ্ধ।

মাল নৌকায় বোঝাই করে এনে ডাঙ্গায় নামানো হ'ত। এই-রকম এক নৌকার মাঝি ছিল কোচ্চুরামন। মাল খালাসের ওপরই তার মজুরী নির্ভর করতো। তবে অনেকের তুলনায় মাল্লাদের আয় ছিল ভালই।

কোচ্চায়প্পন আর কোচ্চুরামনের রোজগার ছিল দিন মজুরীর। মোটামুটি সচ্ছলভাবে তাদের দিন কাটত, টাকা-পয়সাও জমত সামান্য। পাড়া-পড়শীর দরকার পড়লে তাদেরও কিছু দিত। কোচ্চুরামনের মা পারু (পার্বতী)-কে তাই পাড়া-পড়শীরা সম্মান করে চলে।

চাষীদের কাছে কণ্টন পুলয়নের খুব খাতির। দুজনের মাটি কোপানোর কাজ সে একাই করতে পারে। মজুরী পেত দেড়জন মানুষের। তার দিনের রোজগার দিনেই ফুরিয়ে যেত। কণ্টন খেতও যেমন, তাড়ি টানার বহরও তেমনি। গাঁটের কড়ি খরচ করে তাড়ি খেয়ে যখন মন ভরতো না তখন নারকেল গাছে উঠে রস খেতেও কিন্তু করতো না।

কণ্টনের বউ অষকী[১]। তার যে মেয়েটি প্রথমে জন্মেছিল সে বাঁচে নি। দ্বিতীয়টির নাম নীলী। ওর গায়ের রং ফর্সা বলে সবাই তাকে গৌরীনীলী বা ফর্সা নীলী বলেই ডাকত। নীলীকে দেখে সবাই বলাবলি করত যেন কালো মূর্গী সাদা ডিম পেড়েছে। এরও একটা ইতিহাস আছে।

কখনও কখনও বক্কচ্চন নিজের বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। রং তাঁর ফর্সা, রোগা ছিপ-ছিপে গড়ন। একজোড়া গোঁফ, তার ওপর জুলফী, ধুতি আর ফিনফিনে চাদর একটা জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতেন। মনে হ'ত কোন বড় এক রঙ্গমঞ্চে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করছেন যেন। প্রজাদের খোঁজ-খবর নেওয়া আর জায়গা জমির তদারক করাই তাঁর বাগানে বেড়ানোর আসল উদ্দেশ্য। অত্যন্ত

১। শব্দার্থ—সুন্দরী

প্রজাদরদী ছিলেন তিনি। যাদের ঘরে সুন্দরী মেয়ে দেখতেন তাদের প্রতি সহানুভূতির মাত্রাটা একটু বেশী হ'তো। এইরকম এক সহানুভূতির পাত্র হয়ে উঠেছিল ভিটে-বাড়ীর প্রজা কণ্টন পুলয়ন।

অষকী পুলয়ীর[১] চোখদুটো খুব সুন্দর, হাসিটিও বড় আকর্ষণীয়। তাই বক্কচ্চন অনেকক্ষণ তাদের উঠানে বসতেন। আরাম করে বসবার জন্য ক্যানভাসের একটা চেয়ারও মিস্ত্রী লাগিয়ে তৈরী করা হোল। বক্কচ্চন এলেই অষকী তাড়াতাড়ি সেই ক্যানভাসের চেয়ারটি উঠানে এনে রাখত। বক্কচ্চনের পান কিনতে কণ্টনকে কখনও যেতে হতো। শুধু একবারই বক্কচ্চন কণ্টনকে পান কেনবার জন্য একটা টাকা দিয়েছিলেন। কণ্টন যাওয়ার সময় বক্কচ্চন চেঁচিয়ে বলতেন—'ইচ্ছে হলে তাড়ির দোকানটাও ঘুরে যাস্।'

বক্কচ্চন বলুন আর না বলুন, কণ্টন তাড়ি টানতে চলে যেত। পাড়া-পড়শীরা সবাই কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করত। প্রজারা নারকেল পাড়লে, বক্কচ্চন প্রজাদের দুটো করে নারকেল দিতেন। কিন্তু বক্কচ্চন চলে গেলে, কে জানে কিভাবে অষকী দশ-পনেরোটা নারকেল নিয়ে বিক্রী করতে যেত।

কখনও কখনও রাত্রে কণ্টনের কুঁড়ের আশ-পাশের নারকেল গাছ থেকে অনেক নারকেল পাড়ার শব্দ শোনা যায়। প্রতিবেশীরা সবাই জানে বক্কচ্চনকে। 'হুঁ, এই ব্যাপার? দে, ব্যাটাকে আচ্ছা করে ধোলাই দে'—চেঁচিয়ে উঠতেন। তবুও কণ্টনের নারকেল পাড়ার ব্যাপারটা অব্যাহত ছিল।

একবার নারকেল পাড়তে এসে দেখা গেল কোচ্চায়প্পনের উঠানের গাছ থেকে এক বোঝা নারকেল উধাও। বক্কচ্চন একপ্রস্থ ভালমন্দ গাল পাড়লেন। পুলিশে রিপোর্ট করবেন বলে ধমকও দিলেন। কোচ্চায়প্পন জিজ্ঞাসা করল—

১। পুলয়নের বৌ।

"এমন কেন হবে হুজুর? পক্ষপাতিত্ব কেন? কণ্টন পুলয়ন নারকেল পেড়ে নিলে হুজুর রাটি কাটেন না। এটার কি কারণ?"

"সেটা আমার ইচ্ছা। সে কথা জিজ্ঞাসা করবার তুই কে?"

"পক্ষপাতিত্ব করবেন না হুজুর! মাথার ওপর একজন রয়েছেন তো! তিনি সবই দেখছেন।"

আবারও নারকেল পেড়ে নিল কোচ্চায়প্পন। বক্কচ্চন জিজ্ঞাসা করায় বলল—"পক্ষপাতিত্ব করবেন না হুজুর।"

বক্কচ্চনের জমিতে ভুষি-দানা বেচত এমন অন্য আরেকজন স্ত্রীলোক সারাম্মাও[১] বাস করত। সে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভুষি দানা শস্য জমিয়ে রেখে আসত আর বিক্রী করত। কেউ কেউ ওকে লোকের পেছনে লালা সারাম্মা বাকীরা বক্‌বকানী সারাম্মা বলে ডাকে।

বক্কচ্চনের প্রজা হলেও সারাম্মা তার অনুগ্রহ প্রার্থী নয়। তাই সে কোচ্চায়প্পনের কুটিরে যায় আর পারুর সঙ্গে বসে অষকীর নিন্দে করে। ভুষির জন্য তাকে এই পারুই টাকা ধার দিত। তাই এদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব।

'সবাই বলে বক্কচ্চন মশায়ের গরীবদের জন্য খুব দয়া।'

'কেন, তোমার কি মনে হয় যে আসলে তাঁর কোন দয়া নেই?'

'তাই যদি থাকবে তবে তিনি আমাদের দিকে তাকান না কেন?'

'তার একটা কারণ রয়েছে!'

'সেটা কি?'

'শুধু গরীব হলেই হবে না।'

'আর কি তবে হতে হবে?'

'দেখতেও সুন্দরী হতে হবে!'

এই বলে দুজনেই খিলখিল করে হাসতে লাগলো।

১। (সোরা-আম্মা) অর্থাৎ সারার মা। খৃষ্টীয় নাম

যখন অষকীর বাচ্চা হল, পাড়ার সব মেয়েরাই তখন বাচ্চা দেখতে গেল। সবাই ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্‌ল-'এ তো কালো মুর্গীর সাদা ডিম!' সারাম্মাকে পারু জিজ্ঞাসা করল—

'বাচ্চাটা যখন বড় হবে তখন সে কেমন হবে, বলতে পারো?'

'কেমন হবে?'

'বক্কচ্চন মশাইয়ের ছোট ছেলেটাকে দেখেছো?'

'হ্যাঁ দেখেছি।'

'তা ওরকমই হবে!' দুজনে আবার হাসে।

বড় হল নীলী। লম্বা হল মাথায়। বয়স সতেরো। মায়ের সুন্দর চোখ এবং সম্মোহক হাসিটি সে এমনিতেই পেয়েছিল। অষকীর যা ছিল না, সেই পাকা লেবুর মতো রং আর কোঁকড়াচুল ও যেন কোথা থেকে পেয়েছিল।

সবসময়ই সে নিজের দক্ষিণ দিকটার উঠানে গিয়ে সারাম্মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দক্ষিণে দেখে আর যেন ইশারা করে। দুজনের মধ্যে খুব হাসাহাসি চলত। কখনও সখনও আশেপাশের অন্য মেয়েরাও এসে জড়ো হয়। এসবই দেখতে পেত অষকী। সে জানত এরা কি বলছে বা কেন হাসাহাসি করছে। তবে সব দেখেও সে না দেখারই ভান করে, নিজের মেয়ে নীলীকেও সে ওদিকে তাকাতে মানা করত।

কোচ্চায়প্পন আর কণ্টনের মধ্যে কথা নেই। রাস্তা ঘাটে কোথাও দেখা হয়ে গেলে মুখ ঘুরিয়ে নিঃশব্দে দুজনে যার যার পথে চলে যায়।

একদিন ভোরে কোচ্চুরামনকে দক্ষিণের উঠানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পারু জিজ্ঞাসা করল—

'কি রে খোকা, এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে ওই দক্ষিণ দিকে কি দেখছিস?' কণ্টনের উত্তরের উঠানের নারকেল গাছের নীচে দাঁড়ানো নীলী পারুকে দেখে নিজেদের কুঁড়েঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

কোচ্চুরামন মাকে জিজ্ঞাসা করল—'দক্ষিণ দিকে তাকালে ক্ষতি কিসের?'

'তাহলে পুবে তাকাচ্ছিস না কেন?'

'মার চোখে কি হল? মাথা খারাপ হয়েছে?'

'তুইই ত পাগল!'

এরপর রোজই কোচ্চুরামন দক্ষিণ উঠানে দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকিয়ে থাকে, নীলীও নিজের ঘর থেকে উত্তর দিকে তাকায়। দুজনে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে থেকে মাঝে মাঝে মুচকি হাসে। পারু কোচ্চায়প্পনকে ব্যাপারটা জানাল। কোচ্চায়প্পন বলল—

'ছেলে দেখুক না যেদিক তার মন চায়, তোমার তাতে কি?'

'এভাবে দেখতে থাকলেই বিপদ ঘাড়ে এসে পড়বে।'

'তা আমি কি করবো? ছেলেকে বলবো যে এভাবে তাকাতে নেই?'

'আমার বলার উদ্দেশ্য যে ছেলের জন্য এখন মেয়ের জোগাড় করা দরকার।'

'আমি জানতে চাই যে কথাটা কি তার নিজের আগে ভাবা উচিত নয়?'

কোচ্চায়প্পন অবশ্য বুঝত যে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, তাকানো আর হাসির ব্যাপারে সায় দেওয়া উচিত নয়। তা কি করা যাবে? কখনও কখনও দক্ষিণের উঠানের দিকে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে গালাগালি দিত আর বলত পারু—'মেয়েটাও হয়েছে মায়ের মত।'

গোড়ায় সব শুনলেও অষকী না শোনার ভান করে। তারপর

যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন সেও গালাগালি দেয়, উত্তর দেয়, 'আমার মেয়ে আমার বাড়ীতেই থাকে। নিজের ছেলে নিজে সামলাতে না পারলে·····সাবধান, এখানে ধান কাটার কাস্তে হেঁসো রয়েছে।'

কোচ্চুরামন ও নীলীর চার চোখের মিলন হয় যথারীতি আর ওদিকে পারু আর অষকীর মধ্যেও গালাগালির বিরাম নেই।

কোচ্চায়প্পন ও কণ্টন কিন্তু সব জানলেও আজ অবধি এদের কেউ কোন গালমন্দ করেনি। কিন্তু এবারে কোচ্চায়প্পন ঠিক করে নিয়েছে যে কণ্টনকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

রাতের বেলায় গাছে চড়ে হাঁড়ি থেকে তাড়ি বার করে খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিল কণ্টন। কোচ্চুরামনের ভাগের নারকেল গাছেও উঠে চুরি করে সে তাড়ি খেত। একদিন কোচ্চায়প্পন গাছের ওপর কাটারীখানা রেখে এল। না জেনে কণ্টন সে গাছে চড়তেই তার গায়ে কাটারী ঢুকে গেল। আচমকা কেটে গেল গায়ের খানিকটা। খুব সামলিয়ে কোনমতে রক্তমাখা গায়ে কণ্টন গাছ থেকে নীচে নেমে এল। কাছেই লুকানো কোচ্চায়প্পন তখন পাশে এসে জিজ্ঞাসা করল—

'কি ভাই, বেশ মিষ্টি ছিল ত তাড়ি?'

'আমার সঙ্গে এ চাল না চাললেই হ'ত।'

তারপর কণ্টন একমাস অসুস্থ হয়ে পড়ে রইল। পারু আর সারাম্মা বলে বেড়ায় যে চিকিৎসা-পথ্যের সব খরচপত্র বক্কচ্চন মশাই-ই করছেন। এ সময়ও কোচ্চুরামন দক্ষিণ কোণায় উঠানে গিয়ে দাঁড়াত আর মুচকি হাসত।

নীলীর কুঁড়ে ঘর থেকে সব সময় ঝগড়া চীৎকারের শব্দ। কণ্টন কখনও কখনও চেঁচিয়ে বলে উঠত—

'মার লাগাব মেয়েটাকে—কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব।' কণ্টনের ওখানে চাত্তন রোজই আসত। সে ছিল যুবক। ঠিক

করেছিল নীলীকে বিয়ে করবে। তার নিজের এবং নীলীর মা-বাবারও এতে মত ছিল। আসবার সময় সে দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আসে। কিন্তু নীলী তা খেত না। অবশ্য যদি সে হাতে তুলে দিত তাহলে নীলী চেঁচামেচি করত না। কিন্তু লুকিয়ে সবটা নর্দমায় ফেলে দিত। একদিন নীলী ওভাবে মিষ্টি নালায় ফেলে দেবার সময় অম্বকী দেখে ফেলে। জিজ্ঞাসা করে—'এই, তুই নর্দমায় এসব ফেললি কেন?'

'আমার দরকার নেই।'

'কেন?'

'ওর দেওয়া কোনও কিছুই আমার দরকার নেই।'

'তাহলে তোকে আর দিচ্ছে কে?'

'আমায় কারুরই কিছু দেবার দরকার নেই।'

ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে উঠ্ছিল। কণ্টনের কুঁড়ে থেকে একদিন খুব চীৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে ভেসে এল নীলীর কাতর আর্তনাদ।

পরের দিন উঠানের উত্তর দিকটায় এসে চাত্তন খুব জোরে, চেঁচিয়ে বলল—'আমি ওই বদমাইসটার মাথা দু'টুকরো করে দেব।'

সেদিন রাতেই কোচ্চায়প্পন খুব গালাগালি দিয়েছে, চেঁচিয়েছে। এরপর থেকে কোচ্চুরামনকে দক্ষিণে বা নীলীকে উত্তরের দিকটায় আর দেখা গেল না।

[2]

সারাম্মা একদিন পারুকে বলল সে পশ্চিম দিকের ক্ষেতের সীমানায় ছোট নারকেল গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যেবেলায় কোচ্চুরামন আর নীলীকে গল্প করতে দেখেছে। সারাম্মার বানিয়ে বলা অভ্যাস। তাই পারু কথাটা মানতে চায়নি। তবু একা পেয়ে কোচ্চুরামনকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করল। কোচ্চুরামন বলল 'কথাটা ডাহা মিথ্যে।'

কিছুদিন বাদে আবার সারাম্মা পারুকে বলল, কোচ্চুরামন একটা সোয়েটার বুনিয়ে দিয়েছে নীলীকে। একথা জেনে পারুর খুব রাগ হ'লো। সে বলল—'এ সব মিথ্যে কথা আমায় বলো না।'

সারাম্মাও রেগে যায়, বলল—'যদি সত্যি মিথ্যে জানতে চাও এক কাজ কর। এখন নীলীকে পুবের গলিতে যেতে দেখবে, যাচ্ছে মাছ কিনতে। তুমি নিজের চোখেই দেখো ওর পরনে সেই সোয়েটার।'

পারু আর সারাম্মা সেই গলি ধরে গেল। নতুন জাম্পার গায়ে ঝুড়ি হাতে নীলী আসছিল। পারুর মুখে কথা সরে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে গাল পাড়তে লাগল—

'বেশ্যা মাগী কোথাকার! চোখের ঠারে-ঠুরে ভাব করে এখন ছেলেদের কাছ থেকে কাপড়-চোপড় আদায়ও শিখেছে।' তারপর ওর দিকে তাকিয়েও কিছু কথা বলে চেঁচাতে থাকে, তাই শুনে গলির রাস্তায় অনেক লোকজন ছুটে যায়। নীলী কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে অষকী তার হেঁসোটা বাগিয়ে নিয়ে ঝড়ের মত

এসে উদয় হ'ল। পারুও বড় ছুরিটা নিয়ে এগিয়ে আসে। এবার তার কি বলার আছে! দুজনের মধ্যে গালাগালি চলছে। গালাগালি থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। পারু বলল যে সে নীলীকে কোচ্চুরামনের তৈরী করিয়ে দেওয়া জাম্পার ব্যবহার করতে দেখেছে। অম্বকীর কিন্তু বক্তব্য যে নীলী রোজকার পয়সা থেকে জমিয়ে তা দিয়ে নিজেই সেই জাম্পার কিনেছে। শেষে পারু বলেই ফেলল যে সারাম্মা তাকে একথা বলেছে।

হেঁসো উঁচিয়ে তখন অম্বকী সারাম্মার দিকে ধাওয়া করল। চেঁচিয়ে বলল—'ওরে চুড়েল ছুঁচো? তোকে এবার টুকরো টুকরো করে ফেলব। পেছনের দিকে পালিয়ে গেল সারাম্মা। সবাই বলল সে ভয়ে পালিয়েছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দর্জি শঙ্করণকে সঙ্গে নিয়ে এসে সে হাজির। সমবেত সবাইকে সে বলল—'শুনুন সবাই। এ শঙ্করণ। আমায় সে-ই কথাটা বলেছে। এখন আপনারাই একে জিজ্ঞাসা করুন যে কথাটা সত্যি না মিথ্যে।'

সবই বলল শঙ্করণ—'কথাটা সত্যি যে জাম্পারের জন্য কাপড় নিয়ে কোচ্চুরামন আমাকে দিয়েছিল। এও সত্যি সেলাইটা আমিই করেছি। জাম্পারের কাপড়টা ছিল হলদে, তাতে কালো কালো ছোপ।'

সবাইকার বিশ্বাস হ'ল। কারণ সকলেই দেখেছে যে নীলীর জাম্পারটা সে রকমের। এবারেও সারাম্মারই জিৎ হ'ল। অম্বকীকে বিদ্রূপের সুরে সে বলল—'ঐ অম্বকী, হেঁসো এখন গেল কোথায়?'

কয়েকজন ফিসফিসিয়ে বলল, 'মা যেমন মেয়েও তেমন হ'তে চলেছে।' মাথা নীচু করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল অম্বকী। সে রাতেও কণ্টনের ঘর থেকে চেঁচামেচি চীৎকার আর কাতর আর্তনাদ শোনা গেল।

পরের দিন সকালে উঠানে দাঁড়িয়ে কোদালটা হাতে নিয়ে

কণ্টন জানিয়ে দিল আবার যদি এ মেয়ে গিয়ে ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে কিংবা ওদিক পানে তাকায় তবে আমি এইভাবে ওর মাথাটা কুপিয়ে দেব, বলেই উঠানে কোদাল চালিয়ে সে দেখিয়ে দিল।

বিকালে চাত্তন এসে উঠানের বেড়ার ধারে ছুরি উঁচিয়ে প্রতিজ্ঞা করল। যদি সেই শয়তানটা এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলে কিংবা হাসে তাহলে এভাবে ওর মাথাটা আলগা হয়ে যাবে। ছুরি দিয়ে বেড়ার গায়ে একটা কচি পাতায় বিঁধিয়ে দিল। টুকরো হয়ে পড়ে গেল গাছটা।

দক্ষিণের উঠানে এসে ছুরিটা ধার করতে করতে কোচ্চায়প্পন গর্জন করে উঠল—'আবার যদি এ ধরনের কথা শুনি তাহলে ছেলেমেয়ে ত্বজনেরই মাথা এরকম আলাদা করে দেব।' কচি একটা ডাব কাটার মত করে সে দেখাল।

এই ঘটনার পর কোচ্চুরামন ও নীলীর মধ্যে দেখা বা হাসা-হাসি আর হয়নি, কিংবা কেউ আর এরকম কিছু বলেও বেড়ায়নি।

নীলী আর চাত্তনের বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল। ঘরের সামনের উঠানে প্যাণ্ডেল খাড়া হয়েছে। ওদিকে কোচ্চায়প্পন কোচ্চুরামনের বিয়ের ব্যাপারে চার-পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করল। কারুর বাড়ীতে গিয়ে সে মেয়েও দেখেছে ইতিমধ্যে।

এসব যখন চলছিল তখন একদিন কোচ্চায়প্পনের দক্ষিণের উঠানে হাঁকডাক শোনা গেল। প্রতিবেশীরা জেগে উঠে দেখল অম্বকী আর কণ্টন হেঁসো আর ছুরি নিয়ে তর্জন গর্জন করছে, 'আমার মেয়েকে বের করে দাও। নয়ত আমায় নিজেকেই ঢুকতে হবে ভিতরে', পারু দৌড়ে ভেতরে গেল। রাতে যেখানে কোচ্চুরামন শুয়ে ছিল সেখানে গেল। ফিরে এসে চেঁচিয়ে উঠল পারু—'তোর মেয়ে আমার ছেলেকে ফুসলে নিয়ে গেছে। আমি তোকে আর তোর মেয়েকে টুকরো টুকরো করে ফেলব।' সঙ্গে হেঁসোও নিয়ে এল একটা।

কোচ্চায়প্পন একটা গদা উঁচিয়ে চীৎকার করে বলল—'আমার ছেলে ফিরিয়ে না দিলে তোর মাথা আস্ত থাকবে না। কণ্টন ছুরি উঁচিয়ে ছিল কিন্তু তার মাথায় গদার বাড়ি মারল কোচ্চায়প্পন। মার খেয়ে চেতনা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কণ্টন। অষকী হেঁসো নিয়ে মারল পারুকে, পারুও মারল অষকীকে। অষকীর হেঁসোর দাঁত পারুর পেটে গিয়ে বসে গিয়েছিল—তবে পারুর হেঁসোর মাথাটাও অষকীর বুকে গিয়ে লেগেছিল। দুজনেই মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। ভিড় জমে গেল লোকের। ভোরও হল।

'মারব সবাইকে, মেরে ফেলব,' চীৎকার করতে করতে ছুরি উঁচিয়ে চাত্তন দৌড়ে এল। কোচ্চায়প্পনের বাঁশের বেড়া সে উপড়ে দিল। আগুনও দিতে চেষ্টা করেছিল ঘরে। তবে নারকেল গাছ দিয়ে বাধা দিল সব লোকজন।

পুলিশ এল। কণ্টন, অষকী ও পারুকে হাসপাতালে পাঠানো হ'ল। কোচ্চায়প্পন ও চাত্তনকে জেল হাজতে।

* * * *

কারুরই কোন সন্দেহ হয়নি। রোজকার মত রাতের খাওয়া দাওয়ার পর নীলী এসে মাদুর বিছিয়ে অষকীর পাশে শুয়েছিল। রোজের মত কোচ্চুরামনও খেয়েদেয়ে একটা বিড়ি টেনে বারান্দায় এসে শোয়।

হঠাৎ অষকী উঠে চীৎকার করে নীলীকে ডাকতে লাগল। নীলীর আওয়াজ শুনলে সে মাদুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিত। মাদুরে শোয়া না দেখে সে বেরিয়ে এসে খুঁজল। বাইরে না পেয়ে কণ্টনকে ডাকল। তারপর স্বামীস্ত্রী মিলে হাহুতাশ করতে করতে খুঁজতে বেরুল।

হঠাৎ তাদের মনে ভয় হল যে কোচ্চরামন হয়তো এসে তাকে

ডেকে নিয়ে গেছে। এভাবে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে হয়ে দাঁড়াল।

কারুরই কোন ধারণা ছিল না যে নীলী আর কোচ্চুরামন কোথায় গেছে। কেউ খোঁজ খবরও করল না। যাদের খোঁজ করবার কথা তাদের একজন হাসপাতালে আর অন্যজন হাজতে। নীলী আর কোচ্চুরামন গোড়া থেকেই স্থির করে রেখেছিল যে দুজনে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেভাবে তারা তৈরীও হয়েছিল। কোচ্চুরামন আগেই ভেবে রেখেছিল কোথায় আর কেমন করে যাবে।

কোচ্চুরামনের পুরনো পরিচিত এক বন্ধু আলপ্পুষা (আল্লেপী)তে থাকত। একসঙ্গে ওরা খেলাধূলা আর পড়াশোনা করেছে। বন্ধুটির নাম বাসু। সে আলপ্পুষার নারকেল ছোবড়ার কারখানার মালিক। বিয়ে থা করে সেইখানেই বসবাস আরম্ভ করেছিল।

বাসু দু'একবার কোচ্চি (কোচিনে) গিয়েছিল। গেলেই অতি অবশ্যই সেখানে কোচ্চুরামনের সঙ্গে দেখা করত। সে কোচ্চুরামনকে বলত যদি মাল্লার কাজ ছেড়ে আলপ্পুষায় এসে যায় কোচ্চুরামন তবে সে নিজের কারখানায় তারও একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। তাই কোচ্চুরামন আলপ্পুষায় যাওয়া স্থির করে ভেবে নিয়েছিল যে স্থায়ীভাবে সেখানেই বাস করবে।

রাতে সবাই শুয়ে পড়ার এবং রাস্তায় লোকজনের চলাচল বন্ধ হওয়ার পর একটা পোঁটলা নিয়ে কোচ্চুরামন বেরিয়ে এসে গলির মুখে অপেক্ষা করতে লাগল। আগে থেকে ঠিক করা ছিল বলে নীলীও সেখানে পৌঁছে গেল। গলি দিয়ে এসে সাধারণতঃ কম ব্যবহৃত একটা নৌকা করে ঘাটে তারা পৌঁছাল। আলপ্পুষা যাবে এমন একটা নৌকা এলে দেশলাই জ্বালিয়ে ইশারা করে কোচ্চুরামন সেটাকে ডাকল। ধারে এসে ভিড়বার পর ওরা দুজনে সে নৌকায় উঠে পড়ল।

আলপ্পুষায় ঘাটে ওরা যখন পৌঁছাল ততক্ষণে সূর্যোদয় হয়ে গেছে। আগেই বাসু কোচ্চুরামনকে তার বাড়ীর রাস্তা বলে দিয়েছে। তার খোঁজ করতে করতে তুজনে চলল। লোককে জিজ্ঞাসা করে নিঃসংশয় ওরা তুজনে বাসুর বাড়ীতে এসে পৌঁছাল।

বাঁশের দরমা দেওয়া একটা ছোট কুঁড়েতে সপরিবারে থাকত বাসু। পরিবার বলতে তার বৌ ও একটা বাচ্চা। শ্বশুরবাড়ীতে লোকজন বেশী হওয়ায় সে বৌকে নিয়ে আলাদা ঘর বানিয়ে থাকত।

কোচ্চুরামন এসে একটি মেয়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই বাসু ঘাবড়িয়ে গেল। কোচ্চুরামন গোড়াতেই এমন অনুমান করায় আর আশ্চর্য হয়নি। সংক্ষেপে সব কথা সে বলল বাসুকে, বলল যে, কটা দিন তারা বাসুর কাছে থেকে চাকুরী খুজে নেবে। সেটা পেয়ে গেলে থাকবার একটা ব্যবস্থা করবে।

বাসু বলল যে গোলমালের কিছু নেই। যে জাতেরই হোক কোচ্চুরামনের যদি সে মেয়ে পছন্দ হয়ে থাকে তবে বাসুরও সায় আছে। বাসুও ছোটবেলার বন্ধুকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চাইছিল।

কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ীতে আচার বিচারের কিছুটা কড়াকড়ি আছে। ইষব জাতের একটা ছেলে পুলয় মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে জেনে ওরা কেউই কোনভাবে আনন্দিত হবে না। আর সে ছেলে বাসুর বন্ধু জানলে তো আরও আপত্তি করবে। যখন শুনবে যে, পুলয় মেয়েটা বাসুর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছে তখন তো চীৎকার করতে করতে ছুটে আসবে ঘর থেকে দূর করে দেবার জন্য। তাছাড়া আবার বাসুর একটা গুণ্ডামত শালা আছে।

এমন অবস্থায় কি করা যায়? কোচ্চুরামনকে কি করে বলা যায় যে, চলে যাও এখান থেকে। একটা এমন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ওকে কি আলপ্পুষা শহরে নিঃসহায়ভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত? কেবল বাসুর ওপর ভরসা করেই ও আলপ্পুষায় এসেছে।

সবকিছু চিন্তা করে বাসু বলল যে, আপাততঃ ওরা এখানেই থাকুক। তবে নীলীর জাতের কথা সে তার বৌকে জানাল না। সে বোঝাল যে কোচ্চুরামনের আচার অনুযায়ী বিয়ে করা উচিত এবং বৌয়ের নাম হোক ভার্গবী। কোচ্চুরামন নীলীকে ব্যাপারটা জানায়। কিছু পয়সা কোচ্চুরামনের কাছে ছিল। তাই সে সমস্যার উদ্ভব হ'ল না।

সেদিনই কোচ্চুরামন মিস্ত্রী ও ম্যানেজারের অনুমতি পেয়ে বাসুর কাজের জায়গাতেই কাজ শিখতে আরম্ভ করে। এভাবে কেটে গেল তিন চারদিন।

বাসুর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা শুনেছিল যে তার এক বন্ধু বৌ নিয়ে এসে তার ওখানেই রয়েছে। অতিথিদের তারা দেখতেও এল। বৌ দেখে তারা খুব খুশী। সুশ্রী আর বেশ সাদাসিধে ধরনের। একটা বিষয়ে একটু সন্দেহ হল। ইষব জাতের মধ্যে সচরাচর চলিত শব্দ ছেড়ে ঐ মেয়ে পুলয় জাতের মতো কথাবার্তা বলে কেন? বাসুকে বন্ধুবান্ধবেরা (?) জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে বাসু বলল যে কোচিনে পুলয় জাতের অনেক লোক আছে এবং তাদের মধ্যে থাকার জন্যে এ ধরনের কথাবার্তা বলা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু কথাটা শুনে কারুরই বিশ্বাস হল না। অবিশ্বাস নিয়েই ফিরে গেল সবাই।

এসময়ে কারখানার একজন মিস্ত্রী কোচ্চি গিয়ে দু'দিন থেকে এসেছে। ফিরে এসে কথাপ্রসঙ্গে কারখানার সকলকে সে খবর দেয় যে কোচ্চির ইষব জাতের একটা ছেলে পুলয় জাতের একটা মেয়েকে নিয়ে কোথায় যেন পালিয়ে গেছে। আর এই ঘটনার পর ছেলে ও মেয়ের বাড়ীর লোকজনদের মধ্যে মারপিট হয়েছে। দু'তিনজন হাসপাতালেও গেছে। এ শুনে বাসু ও কোচ্চুরামন ঘাবড়ে যায়। রক্তপাত হয়েছে জেনে কোচ্চুরামন খুব ভয় পেয়ে গেল। আর বাসুর ঘাবড়ে যাওয়ার কারণটা ছিল

ভিন্ন। সে ভাবল যে প্রতিবেশী আর শ্বশুরবাড়ীর সবাই যদি বুঝে যায় ব্যাপার, তাহলে ত খুব গোলমাল হবে।

একদিন বাসুর সেই গুণ্ডা শালাটা এসে তাকে বলল—"যদি তুমি সেই লোক আর পুলয়ী মেয়েছেলেটাকে এখান থেকে না তাড়িয়ে দাও, তাহলে জেনো যে আমি নিজেই এসে একটা হিল্লে করব।"

কোচ্চুরামন বুঝল যে শেষ অবধি ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে ঠিক করল যে বাসুকে বিপদে না ফেলে নিজেদেরই ওখান থেকে সরে পড়া উচিত। কিন্তু যাবে কোথায়? পরিচিতদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করে কারুর বাড়ীতে থাকার সুবিধা হবে কিনা।

রিক্সাওয়ালা পত্রোস জানাল যে তার কাছে ওরা থাকতে পারে। কিন্তু বাসু মানা করে। পত্রোসের বাসা বাসুর বাসার গায়েই। পত্রোসকে জানে না এমন কেউ আলপ্পুষা শহরে ছিল না, ছোটবড় সবাই চিনত তাকে। সবাই ঘৃণা করত, ভয়ও পেত।

চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করা তার অভ্যাস। রিক্সার ডাণ্ডায় পা রেখে বিড়ি ফোঁকে। কখনও কখনও গুনগুন গান করতে করতে খালি রিক্সা টেনে নিয়ে যায়। পত্রোসকে সব সময় রিক্সা সমেতই দেখা যেত। কিন্তু তার আসল কাজটা রিক্সা চালানো নয়। সবাই জানত সে কথা। কোন অজানা মানুষ যদি রিক্সা খুঁজত, তাহলে পত্রোস বলত—'মশাই সওয়ারী নেব না। অন্যদিকে যাচ্ছি আমি—এক ভদ্রলোককে নিয়ে আসতে হবে।'

সন্ধ্যে পেরিয়ে গেলে পত্রোসের রিক্সা ছুটে চলত। গলির রাস্তা ঘুরে যেসব রাস্তায় লোক চলাচল কম, সেসব দিকেই তখন তার গতিবিধি। সে সময় রিক্সার পর্দাও টাঙ্গানো থাকে। সবাই জানত এই পর্দা নামানো রিক্সাটা কোথায় এবং কেনই বা যায়। কিন্তু দেখেও না দেখার ভাব করে সকলে। সরকারী পদস্থ আর পয়সাওয়ালাদের বিশেষ বাসনা পূরণের ব্যবস্থা করত সে। তাই লোকে তাকে ঘৃণা করত। তাছাড়া ভয়ও পেত।

কিন্তু কোচ্চুরামন এসব বিন্দুমাত্রও জানত না। তাই বাসু যখন ওকে পত্রোসের ওখানে যেতে বারণ করে, তখন সে জিজ্ঞাসা করল—

"আটকাচ্ছো কেন? অন্তত সে হিন্দু নয়, খৃস্টান মনে হচ্ছে। সেখানে কেউ এসে জানতে চাইবে না যে তুই কোন্ জাত?'

'সেটা ঠিক। তবু একটা ব্যাপার আছে।'

'কি সেটা?'

'সেখানে গিয়ে থাকার পর তোমার অন্য মেয়েছেলে দেখতে হবে।'

'তার মানে?'

'মানে… · ব্যাপারটা তাই।'

'বলো তো বাসু।'

'রাত হতেই সে তোমার বৌকে বলবে—

চলো, রিক্সায় ওঠো এসে।'

'কেন?'

'কেন? চাইবার লোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য।'

আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না কোচ্চুরামন। এ প্রসঙ্গে পত্রোসের সঙ্গে আর সে কোন কথাও বল্‌ল না।

এখন কি করা যায়? থাকবে কোথায়?

[3]

রবীন্দ্র মশাই বড় জমিদার। আলপ্পুষা আর তার আশেপাশে তাঁর বেশ কয়েকটা নারকেল বাগান ছিল। শহরের মধ্যে কয়েকটা বাংলো বাড়ীও তাঁর ধনসম্পত্তির পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

গোড়ায় ইংরেজরাই আলপ্পুষায় নারকেল ছোবড়ার কারখানা

খোলে। পরে এদেশীয়রাও ছোট ছোট কারখানা শুরু করে। তবে এরা ইংরেজের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। তাই রবীন্দ্র মশাই ইংরেজদের কারখানার সঙ্গে যাতে পাল্লা দিতে পারে এমনি বড় একটি কারখানা খুললেন।

তবে লোকদের তিনি বলতে লাগলেন যে প্রজাদের অর্থকরীভাবে সাহায্যের জন্যে এই কারখানা শুরু করেছেন। যদিও খাঁটি কথাটা জানতো যারা তারা এ কথা বিশ্বাস করে না, কিন্তু অন্য অনেকে এটাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল।

আসলে এ এমনই একটা ব্যবস্থা যাতে জমিদার শ্রেণী পুঁজিপতি হয়ে ওঠে আর প্রজারা দিন মজুর হয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় মজুরদের বেঁধে ফেলার শিকলের এক দিক মালিকের বাড়ীতে আর অন্য দিকটা কারখানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্র মশাই ব্যবস্থাটা বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছেন। কায়িক শ্রমের প্রয়োজন হয় কারখানার কাছে আর তাতে তিনি সমর্থ লোকেদেরই নিয়োগ করেছিলেন। তাই লোকজনের চোখে তিনি দয়ালু মালিক হয়ে থাকতে পারছিলেন।

রবীন্দ্র মশাইকে নিজের দুঃখের কথা বলবে বলে কোচ্চুরামন স্থির করেছিল। তাঁর বাড়ী গিয়ে সে দেখা করল এবং নিজের দুর্দশার কথা বলল। কোচ্চির এক ইষব আর পুলয়ী বৌএর অসবর্ণ বিয়ের দরুন তাদের দুজনের থাকবার ঠাঁই যে কোথাও মিলছে না তা সে বলল। সব শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'তার মানে তুমি এখন ইষব হয়ে আছ আর তোমার বৌ পুলয়ী ?'

'কি আর করবো হুজুর' ? কোচ্চুরামন জিজ্ঞাসা করে।

'হ্যাঁ, কি আর করা ?···পরে তা বলব'খন। এখন একটা কাজ কর। আমার জমিতে একটা ঘর তৈরী করে থেকে যাও। আমার কারখানায় তোমায় কাজ দিয়ে দেব।'

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কোচ্চরামন। ঘর তৈরীর কথাটা

বলার পর রবীন্দ্র মশাই বললেন—'বাঁশ, নারকেল পাতা-টাতা আমার এখান থেকেই নিতে পার।' কোচ্চুরামনের দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নামল।

মালিকের সেই জমিটা কারখানা থেকে বেশী দূরে নয়। তার সীমানায় এসে দাঁড়ালেই কারখানার অফিস ঘরের দরজা দেখা যেত।

নারকেল গাছের এলাকা এতই বড় যে কাঁটাগাছের বেড়া দিয়ে চারপাশ ঘিরে দেওয়া হয়েছিল। বাগানের পূর্ব দক্ষিণে আর উত্তর প্রান্তে রাস্তা। সীমানার মধ্যেই কয়েকটা ঝরনাও ছিল। কোচ্চুরামনের ছাড়া আরো ছটা কুঁড়ে ছিল সেখানে। সে সব ঘরে স্ত্রী-পুরুষ সবাই রবীন্দ্র মশাইয়ের নারকেল ছোবড়ার কারখানার শ্রমিক।

নারকেল পাতা আর বাঁশ দিয়ে গোয়াল ধরনের ঘর বানিয়ে নিল কোচ্চুরামন বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রাস্তার ধারে। রান্নার আর শোবার জন্য দু'খানাই মোটে ফালি ছিল তাতে। ঘরের ছাতও খুব নীচু। কোচ্চুরামনকে হেঁট হয়ে চলতে ফিরতে হ'ত।

যেদিন থেকে সে বাস করতে শুরু করল সেদিন রবীন্দ্র মশায়ের বাড়ী গিয়েছিল কোচ্চুরামন ও নীলী। তার স্ত্রী ও মেয়েরা নীলীকে অন্দরমহলে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুশলপ্রশ্ন সব করছিলেন। সবাইকেই নীলীর ভালো লেগেছে। তারা ওকে একসের চাল, একটা নারকেল, কিছু নুন-লংকা আর পুরানো কাপড় দিয়েছিলেন।

সেঘরে তাদের সংসার শুরু হ'ল। পরদিন থেকেই কোচ্চুরামন রবীন্দ্র মশাইয়ের কারখানায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে!

নীলী কখনও কখনও মালিকের বাড়ীতে যেত। কিছু না কিছু কাজ তার জুটে যেত। কেউ বলুক আর নাই বলুক নজরে পড়লে তেমন কাজ সে নিজে থেকেই করত। পরিবর্তে চাল, খাবার-দাবার যা পেত তা ঘরে নিয়ে যেত নীলী।

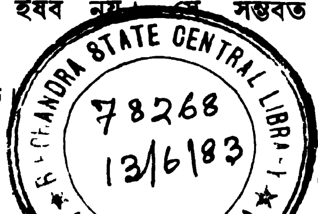
সে বাগানে আরো ছটা পরিবার থাকলেও কোচ্চুরামনরা একদম

নিজেদের নিয়েই থাকত। অর্থাৎ কোনও ভাবে তাদের অন্য কোন পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। যেন কোন অদ্ভুত কিছু দেখছে এমনি ভাবে প্রতিবেশীরা তাদের দিকে দেখত। ইষবনের সেই ভাগিয়ে নিয়ে আসা পুলয়া বৌটা সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল ছিল। তাকে দেখে কারুর চোখে ফুটে উঠত ঘৃণা, কারুর বা ক্রোধ।

নীলীর ঘরের উত্তর দিকটায় থাকত একটি ইষব পরিবার। সেখানে নানী (নারায়ণী) থাকত। তার নীলীর প্রতি ছিল সবচেয়ে বেশী ঘৃণা আর রাগ। কারণটা কেবল জাতিগতই ছিল না। নানী মেয়েটা ছিল কুরূপা যদিও সামাজিক অবস্থা নীলীর মতই। তার চোখ ট্যারা আর জোঁকের মত পুরু ঠোঁট। কেলে কুৎসিত মেয়েটার পাশে নীলীর দিকে চোখ গেলেই খুব রাগ হত। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলত—'লোকটার কি একটা ইষব মেয়েও জোটেনি যে পুলয়ী মেয়েটাকে ভাগিয়ে নিয়ে আসতে হ'ল?'

নানীর ঘরের লাগোয়াই কুঞ্চুর ঘর। সকালে কুঞ্চু বেরিয়ে গেলে সেখানে সব সময়ই চীৎকার, চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি লাগিয়ে রাখে একটা বদমাস ধরনের ছেলে আর কারণে অকারণে চীৎকার করা একটা মেয়ে মিলে। মেয়েটি এমন যে ছেলেপিলের দুষ্টুমি আর চেঁচামেচির জন্য সে স্বামী, প্রতিবেশী এমনকি ভগবানকে পর্যন্ত গালাগালি করত। কখনও কখনও নানী গৌরীর কাছে গেলে, দুজনে মিলে এরা কোচ্চুরামন আর নীলীর সম্পর্কে নানারূপ টিপ্পনী কাটত। এরা নিজেরা আস্তে ফিসফিস করে কথা বললেও সে মেয়ের গলার আওয়াজ চারপাশের ঘরে গিয়ে পৌঁছুত। গৌরী বলত, নানী দিদি, একথা মিথ্যে যে কোচ্চুরামন ইষব জাতের লোক। সে মোটেই ইষব নয়। সে সম্ভবত কোনও পুলয় বা পরায়ণ।'[১]

১। পুলয়ের মত আরেক অন্ত্যজ জাতি।



কুঞ্জুর ঘরের অন্যপাশে দুটি খৃস্টান পরিবার থাকত। জোসেফ আর স্কবিয়ার পরিবার। জোসেফ ও তার বড় দুই ছেলে নারকেল ছোবড়া কারখানার শ্রমিক। তাই এই পরিবারের মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে যেত। এধারে চীৎকার চেঁচামেচিও অত শোনা যেত না। জোসেফের বৌ মারিয়াম্মা কখনও কখনও নীলীর ঘরে যেত। নীলী ওদিকে তাকালে কিন্তু এরা তাড়াতাড়ি সরে আসত।

স্কবিয়ার ঘরখানা ছিল নরককুণ্ড। বৌ তার রুগ্ন, উঠে চলে বেড়াবার ক্ষমতাও ছিল না। যে দুটো ছেলে ছিল, তারা কেবল ফোঁড়া প্যাঁচড়াতে ভুগত। বিকেলে কাজ থেকে ফিরে স্কবিয়া সেই নরকেই বন্দী হয়ে যেত।

সেই বড় ঘরখানার উত্তর-পশ্চিমে আরো দুটো কুঁড়ে ছিল। একখানা কুঞ্জিপেন্নু আর অন্যখানা বেলায়ুধনের।

কুঞ্জিপেন্নুর ছেলে ভাস্করণ সাবালক হয়ে উঠেছে। ভাস্করণের কাছাকাছি বয়সের তার এক বন্ধুও ছিল—নাম রামন। সে ছিল দর্জি। তবে মুখ্যত সে প্রেমিক হয়েই কাটাতে চাইত। মায়ের মতোই এক হিসেবে ছেলে ভাস্করণও প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল।

কখনও কখনও ভাস্করণ নীলীর ঘরের দিকে তাকিয়ে সিটি দেয়। অনেক সময় গলির রাস্তায় গিয়ে বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকির চেষ্টা করে। প্রশ্নও করত বেড়ার গায়ে দাঁড়িয়ে—

'কোচ্চু রামন দাদা, আছ ওখানে?'

'না'—গম্ভীর হয়ে নীলী জবাব দিত।

'কখন ফিরবে?'

'সন্ধ্যে বেলায়।'

'এলে বলে দেবেন আমি এসেছিলাম।'

'আচ্ছা।'

'বলতে পারেন কে এসেছিল?'

'কে?'

ইপেন্নুর ছেলে—ভাস্করণ।'

'আচ্ছা।'

প্রশ্নের সব উত্তর পাওয়া গেলেও জবাবগুলো আশা জাগাত না। তবু নিরাশ হ'ত না ভাস্করণ। তার ধারণা ছিল, যে দেয় না তার কাছে বারে বারে চেয়েই যেতে হবে।' বারবারই সে আসত আর এভাবে কথা বলত।

বেলায়ুধনকে তিনটি ছোট বোন ও বিধবা মায়ের দায়িত্বভার সামলাতে হত। সে ছোবড়া কারখানার কাজে যেত আর মা বোনেরা মিলে দড়ি পাকাত। অন্যের ঝগড়া-ঝাটির মধ্যে থাকার তাদের দরকারই ছিল না। তবু দড়ি পাকানোর সময় নীলীর ঘরের দিকে ওদের দৃষ্টি যায় আর কিছু না কিছু বলাবলি করে এরা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব করতে চাইত নীলী। ওদের কিছু বলতে, ওদের থেকে কিছু শুনতে চাইতও। তার ও কোচ্চুরামনের মধ্যে ভালবাসার উদ্ভব কেমন করে হ'ল তা বলার ইচ্ছা হ'ত, কোচ্চুরামন উত্তরের উঠানে আর সে দক্ষিণের উঠানে গিয়ে কেমন পরস্পরের প্রতি তাকাত আর হাসত, দুই পরিবারে কেমন করে ঝগড়া বাধল আর তার পরিণতিতে তাদের কত কষ্ট সইতে হয়েছে। শেষ অবধি উপায়ান্তরহীন হয়ে কেমন করে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা—এমনি সব কথা। কাউকে সব বলতে পারলে মনেও যেন একটা ভরসা পাওয়া যেত। তেমনি প্রতি-বেশীদের কাছে জানতে ইচ্ছা হত—কেমন তাদের দাম্পত্যজীবন, তাদের দুঃখসুখের কথা, তাদের মিত্রই বা কে, শত্রুই বা কে—ইত্যাদি। যাই হোক, সে তো মেয়েই, তাকে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে যোগাযোগ রেখেই চলতে হবে।

সে যদি না বলে, তবে ওপক্ষই বা বলবে কেন ওকে? এদিকে যদি কেউ না আসে, তবে ওপাশেই বা কে যাবে? কোচ্চুরামনের কথা আলাদা। কারখানায় গেলে কিছু লোকের সঙ্গে তার

দেখা হওয়া বা কথাবার্তা সম্ভব। কিন্তু নীলী বেচারী করে কি? হ্যাঁ, সে কখনও মালিকের বাড়ী যেত বা কাজকর্ম একটু করত। তবে তাদের কি বলবে সে? তারা তো সব বড়লোক। তারা কি আর তার মত সামান্য লোকের সামান্য কথা শুনতে চাইবে? এক কথায় নিজের এই একাকিত্ব ক্রমেই নীলীর অসহ্য হয়ে উঠল।

প্রতিবেশীদের ঘরে প্রায়ই খৃষ্টীয় উপদেষ্টার[১] দল আসে—তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী দুইই থাকে। কখনও কখনও মহিলা উপদেষ্টারা ওখান থেকে নীলীর ঘরের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখে আর মুচকি মুচকি হাসে। নীলী জানতও না যে এরা কোথা থেকে আসে, কেন আসে। তবে এটা জানত যে এরা সব ঘরেই যায়।

একদিন যখন দুই উপদেষ্টনী ওর দিকে তাকিয়ে হাসল তখন ও জিজ্ঞাসা করল—'এ পাশে কেন আপনারা আসেন না?'

এরা গলি ছেড়ে উঠানে এল, খুব মিষ্টি কথায় তার খোঁজ-খবর নিল। সে তাদের ঘরে আসতে বলল। অসঙ্কোচে ভেতরে এসে তার বিছিয়ে দেওয়া মাদুরে বসল। তাকে প্রশ্ন করতেই—তার মুখ দিয়ে বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত—কথার তোড় ছুটল। সে সব কিছুই বলে ফেল্‌ল।

ক্ষমা আর সহানুভূতির সঙ্গে তারা সব শুনে দুজনে তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালো। শুধু এই-ই নয়, বাইবেল থেকে কিছু পড়ে উপদেশ দিয়ে বলল, 'পাপের নিষ্কৃতির জন্য মহাত্মা যীশুর পথে চলে এসো।'

নীলী আশ্বস্ত বোধ করে। যতটুকু তার বলার ছিল তা সে বলে দিয়েছে। সারা দুনিয়াকে নিজের যে প্রেমকাহিনী বলতে চেয়েছিল, তাদের সে শুনিয়েছে সব। আরও কিছু সে বলতে চেয়েছে। তারা শুনবে বলে কথাও দিয়েছে। এ এক মস্ত আশ্বাস!

১। খৃষ্টধর্ম প্রচারক পুরুষদের উপদেষ্টা আর মহিলাদের উপদেষ্টনী বলা হয়।

সেদিন বিকেলে কোচ্চুরামন কারখানা থেকে ফিরলে পর নীলী উপদেষ্টিনীদের আসার কথা বলল। কোচ্চুরামন জিজ্ঞাসা করল—

'কি, আবার আসবে ওরা?'

'হ্যাঁ, বলেছে ওরা আবার আসবে।'

কোচ্চুরামন নীলীর এই দম আটকানো অবস্থাটা জানত। তাই সে এদের আসাটা সহাস্যে অনুমোদন করে ও স্বাগত জানায়। সাক্ষাতের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। শুধু তাই-ই নয়, কোচ্চুরামনের চিন্তায়ও একটা পরিবর্তনের আভাস দেখা দিল।

এভাবে কিছুদিন গেল। কাজের শেষে ফিরে একদিন কোচ্চুরামন দেখতে পেল যে কুঁড়ের বেড়ার ভেতরের দিকটায় একটা ছবি টাঙানো। সেটা মহাত্মা যীশুর ছবি। দুনিয়ায় পাপমোচনের জন্য তিনি নিজেই ক্রুশে চড়েছিলেন। কোচ্চুরামন খুব খুঁটিয়ে ছবিটা দেখে। ঈশ্বরের বার্তাবহের হাত পা আর বুক বেয়ে রক্তধারা বয়ে যাচ্ছে। কাঁটার মুকুট পরা মাথা আনত ও স্থির। কোচ্চুরামনের চোখ জলে ভরে আসে।

সেদিন সন্ধ্যায় সেই ছবিটার নীচে নীলী মোমবাতি জ্বালাল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছবির সামনে বসল। নীলী ভজন গাইল এবং কোচ্চুরামনও সঙ্গে সুর মিলালো।

দুজনেই স্থির করল যে যীশুর পথেই চলতে হবে। পরের দিন কোচ্চুরামন রবীন্দ্র মশাইয়ের বাড়ী থেকে ফিরে এসে নীলীকে বলল—

'হুজুরও বললেন যে এটা ভালো কাজই হচ্ছে!'

'কোন কাজটা?'

'যীশুর পথেই আমাদের চলা উচিত হবে।'

কোচ্চুরামন আর নীলী জ্ঞানস্নান করল অর্থাৎ ব্যাপটাইজড্ হ'ল। এখন কোচ্চুরামন হ'ল 'বর্কি' আর নীলী হয়ে গেল 'এলী'।

[4]

নারকেল পাতার চাটাই বোনায় খুব পাকা হয়ে উঠল বর্কি। তার বুনন খুব পাকাপোক্ত আর সুন্দর। যেহেতু সে খুব বেশী কাজ করত, মজুরীও মিলত বেশী। রবীন্দ্র মশাইয়ের সে প্রিয় কারিগর হয়ে উঠল আর তাই শ্রমিক মহলে তার আলাদা প্রতিপত্তিও ছিল।

রবীন্দ্রমশাই নিজের জায়গা জমি দেখতেও বেরুতেন না। প্রজাদের ওখানেও যেতেন না। তার জন্য আলাদা আলাদা লোক ছিল। কিন্তু একদিন ঘুরতে বেরিয়ে বর্কির বাড়ীতে গেলেন। বর্কির আর এলীর কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরদোর দেখলেন। শুধু তাই-ই নয় বাড়ীঘর আর একটু বড় ও সুন্দর হওয়া উচিত এবং তাতে তালা লাগাবার ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে মালিক পরামর্শ দিলেন। বাঁশ ও নারকেল পাতা ইত্যাদি তিনি নিজেই দেবেন বললেন।

রবীন্দ্রমশাই আসার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের লোকেরা তাঁকে দেখতে আর শ্রদ্ধা জানাতে বর্কির উঠানে এসে জড় হল। তিনি অন্য কারুর বাড়ীতে আর যাননি, এখানে বসেই সবার খবরাদি করলেন। এ ঘটনায় প্রতিবেশীদের কাছে বর্কি আর এলীর মর্যাদা বেড়ে গেল। প্রতিবেশীরা এরপর থেকে এলীর কাছে আসতে, তাকে তাদের ঘরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করল।

বেশ ভালো একটা ঘর তৈরী করল বর্কি। বাঁশ, দরমার তৈরী সেই ঘরখানায় জানালা, দরজা, চৌকাঠ সবই ছিল। রান্নার ছাড়াও আরও দুটো ঘর ছিল, সামনে চওড়া একটা বারান্দা আর পেছন দিকটাতে একটা কামরা। ওরা দুজনে মোমবাতি জ্বালিয়ে রোজ সেখানে প্রার্থনা করত। রবিবার যেত গির্জায়।

এলী গর্ভবতী হল। একটি ছেলে হল তাদের। তার নাম রাখা হল এ্যান্টনী। দারিদ্র্য তেমন ভয়াবহ না হওয়ায় এবং দুঃখকষ্টও তুলনায় কম থাকায় ছোট এই পরিবারটির জীবনধারা পাহাড়ী ঝর্ণার মতোই বয়ে যেত। বর্কির মন সব সময়েই তার বাড়ী আর কারখানার কাজের চিন্তার মধ্যে ছিল। অন্যের কথা আলোচনা কিংবা কথায় থাকার সময়ও ছিল না। কারখানায় গিয়ে কাজে ডুবে যাওয়া আর বাড়ী ফিরে এলী আর এ্যান্টনীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা—ব্যস্, এইটুকুর সময়ই ত'র হত আর তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকত।

দু'বছর বাদে আবার এলী গর্ভবতী হল। এবারেও তার ছেলে হল। তার নাম রাখা হল রোক্কি।

এলী তার পুরো সময়টুকু বাচ্চাদের প্রতিপালন আর স্বামীসেবায় অতিবাহিত করে। বর্কির অবশ্য অতটা সেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে বাড়ী ফিরে আবার একটা কোন কাজ করে বর্কি এটাও এলীর পছন্দ হত না। এক এক সপ্তাহ বাদে হাতে যা মজুরী পেত বর্কি তার সবটাই এলীর হাতে দিয়ে দিত। এলীও প্রতিটি পয়সার সদ্ব্যবহার কি করে করতে হয় তা জানে।

কখনও কখনও বাইরে কোথাও হৈ হৈ হয়। রাজনৈতিক আর সামাজিক ব্যাপারে গণ্ডগোলের আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে বর্কি মন দিত না বা দিতে চাইতও না।

কারখানার মধ্যে এবং বাইরেও শ্রমিকরা কথাবার্তা বলে, চীৎকার করে। নিজে সে যা পেত তাতেই সন্তুষ্ট ছিল। অধিকার ব্যাপারটা সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা আদৌ নেই।

যখন শ্রমিকরা মিস্ত্রী আর কেরানীদের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করত তখন বর্কি নীরব থাকত। তবে রবীন্দ্র মশাইয়ের নামে কেউ কিছু বললে সে সহ্য করতে পারত না। সে বলে উঠত—

'আরে, মালিক আর বাবুমশাই কারা জান ?—মালিক ত ভগবান।

আমাদের রক্ষা করতেও উনি, দণ্ড দিতেও উনিই পারেন। জানো সেটা?'

পাঁচ বছর বাদে তৃতীয় সন্তান হল এলীর। একটি মেয়ে। নাম রাখা হল আন্না।

বর্কির মত শক্তপোক্ত গড়নের ছিল এ্যাণ্টনী। তবে খুব কৌতূহলী। সব কিছু জানতে চাইত সে। যা দেখত, কোনও না কোন ভাবে পড়ে ফেলত, তাকে দেখে মনে হত সর্বদাই সে চিন্তামগ্ন। কারুর সঙ্গে দেখা হলে প্রশ্ন একটা না একটা করতই।

রোক্কির স্বভাব ছিল বিপরীত। সে ছিল ঝগড়াটে। প্রতিবেশীদের কাছে গেলে বাচ্চাদের মধ্যে কোন না কোন ছুতোয় ঝগড়া লাগিয়ে দিত। রোজই স্কুলে তার নামে নালিশ হত। এক একদিন এলী ধরে তাকে মারত। কিন্তু বর্কি ছেলেপিলেদের মারধোরের পক্ষপাতী ছিল না।

মায়ের মতোই হয়েছিল আন্না। তবে রংটা মায়ের মত মাজা নয়, শ্যামলা। চোখ মায়ের মতই। কিন্তু সে চোখ বিষাদমাখা। ভজন আরাধনায় তার অনেক আনন্দ। মহাত্মা যীশুর ক্রুশবিদ্ধ ছবিখানা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখত। মনে হত চোখ জলে ভরে রয়েছে। কখনও সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত—যেন হৃদয়ের সব করুণা ঝরে পড়ছে।

এ্যাণ্টনী পঞ্চম আর রোক্কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ত। আন্না তখন কেবল অক্ষর পরিচয় শুরু করেছে।

এই ছোট্ট পরিবারটি ক্রমশ বড় হতে শুরু করেছে। পাঁচটি প্রাণীর পেটে দেবার মত খাবার আর পরনের কাপড়ের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া এ্যাণ্টনী ও রোক্কির পড়ার খরচ রয়েছে। বর্কির মজুরী যা মিলত তাতে এত সব প্রয়োজন মিটানো কঠিন। মা বাবা নিজেদের খাবারের পরিমাণ নিয়েও ভাবত। মনে করত যে এ থেকেও বাচ্চাদের দেওয়া দরকার। বাপের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে

যাচ্ছে। বর্কি আগের মত আর চাটাই বুনতে পারে না। তাই তার মজুরীও কমতে শুরু করেছে।

কারখানায় শ্রমিকদের ফিসফিসানির জের তাদের বাড়ী পর্যন্ত গিয়ে পোঁছেছে। এই গুঞ্জন চায়ের দোকান, পানবিড়ির দোকান মায় চৌমাথার মোড় অবধি পোঁছালো। এই আবেগ অনুভূতির মূল কারণ কিন্তু কেউ জানে না। মিস্ত্রিদের দোষ দিত কেউ, কেউ বা মুন্সীদের। ম্যানেজারের সম্বন্ধে কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করত। আবার কেউ স্বয়ং মালিকের প্রতি দোষারোপ করে। তবে রোগী জানত না যে রোগটা কি। রোগ নির্ণয়ের মত চিকিৎসকও কেউ ছিল না। রোগীর প্রতি দৃষ্টি ফিরলে সকলে হাহুতাশ করত।

জোসেফের দুই ছেলে মাত্রায়ি ও সাইমনও কারখানার দুই শ্রমিক। এরা বেলায়ুধনের খুব বন্ধু। কারখানা থেকে ফিরে বেলায়ুধনের উঠানে বসে এরা গল্প করতো। একদিন বেশ জোরে বেলায়ুধন বলে উঠল—'আমাদের বাঁচাবার জন্যই নাকি মালিক কারখানা চালু করেছেন। কিন্তু দেখো, তিনি তো রোজই মোটা হচ্ছেন আর আমরা মরছি সবাই।'

নিজের ঘরে বসে বর্কি সে কথা শুনে উঁচুস্বরে বলল—

'বেলায়ুধন, ভগবানের নিন্দা করতে নেই।'

এ্যান্টনী আস্তে আস্তে বলল, 'উনি তো ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন?'

'ওরে কি বললি তুই?' বর্কির জিজ্ঞাসা।

'আমি বলছি যে ওঁর কথাটা সত্যি।'

'না রে খোকা, সে কথা সত্যি নয়। মালিকই ত ভগবান।'

আপত্তি জানিয়ে মাথা ঝাঁকালো এ্যান্টনী। সে বাবার সঙ্গে তর্ক করতে চায় না।

সপ্তম শ্রেণীর পাঠ শেষ হওয়ার পর বাবাকে এ্যান্টনী বলল—'বাবা আমি এখন কারখানায় চাকরী করব।'

বর্কি মত দিল। রোকি বলল যে সে-ও যাবে চাকরী করতে কারখানায়। তাকেও সম্মতি জানিয়ে দিল বর্কি। পরে বলল—

'খোকা, আমি তো আর এখন আগের মত কাজ করতে পারি না।'

'এরপর ছেলেরা রোজগার করে বাবাকে খাওয়াবে', এলী বলল। কারখানায় যেতে শুরু করল এ্যান্টনী আর রোকি। দুজনেই ওরা বর্কির ছেলে। তাই কারখানায় ওদেরও প্রতিপত্তি হ'ল। কাজও তারা তাড়াতাড়ি শিখে নিল।

ওরাও রোজগার করতে শুরু করল। যা পেত সবই ওরা মায়ের হাতে দিয়ে দেয়। স্কুলে যেত আন্না। সে সকলেরই খুব প্রিয়। মা, বাবা আর ভাইদেরও। ভালো ভালো কাপড় জামা পরিয়ে ওকে স্কুলে পাঠানো হ'ত। বাড়ীতেও ওর একটা বিশেষ স্থান ছিল। যেদিন মজুরী পেত, সেদিন তার বাবা ও ভাইয়েরা তার জন্য কিছু না কিছু উপহার কিনে আনে। আন্নাও সবাইকে ভাগ করে দিয়ে তবে নিজে খেত।

তার দুনিয়াটা ছিল বাবা, মা, ভাইদের আর ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে ঘিরে। স্কুলে যেত আর পড়া-শুনা নিয়ে থাকত সে। কোন বান্ধবী বা সঙ্গিনী ছিল না। একলাই স্কুলে যেত, ফিরতও একা একা।

এ্যাণ্টনী ও রোকির প্রতিবেশীদের মধ্যেও আবার বাইরেও বন্ধু-বান্ধব ছিল। ভোরে বাসী কঞ্জি (মাড় মেশানো ভাত) খেয়ে ওরা কারখানায় যায়, দুপুরে বাড়ী এসে আবার কঞ্জি খেয়ে বেরোয়। ফিরতে রাত হয়।

এলী ছেলেদের খাবার দেবার অপেক্ষায় থাকে। খেয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ে রোকি। কিন্তু এ্যাণ্টনী কেরোসিন তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে একটু পড়া-শুনা করত। কখনও কখনও জেগে উঠে রোকি জিজ্ঞাসা করত—

'আরে এত কি পড়ছিস্?'

এ্যাণ্টনী কোনও জবাব দেয় না। সে রেহাই পাবার জন্য দৈনিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাই পড়তে থাকে।

তখনকার দিন মিস্ত্রীদের মজুরকে গালাগালি দেওয়া, মারধোর করার রেওয়াজ ছিল। কখনও বা সেটা মিস্ত্রীদের নিজেদের দোষেই, কখনও বা কারখানার অফিসারদের আদেশে গালি বা মার-ধোর হত।

একদিনের ঘটনা। সাইমন যখন চাটাই বুনছে, সে সময় হঠাৎ পেছন থেকে এসে মিস্ত্রী তার মুখে থাপ্পড় বসায়। মুখ থুবড়ে নীচে পড়ে যায় সাইমন। সামান্য ঘটনা এটা, তাই কেউ আর নিজের জায়গা থেকে নড়েনি।

চাটাই বুনছিল মাত্রায়ি। চট্ করে দৌড়ে এসে ভাইকে সে ধরে ফেল্‌ল। সে জিজ্ঞাসা করল,—

'মিস্ত্রী, একে কেন মারলে?'

'তোর তাতে কি। খবরদার বদমাইস'—গর্জন করে উঠল মিস্ত্রী।

'কেন মারলে মিস্ত্রী? বল না?' আবার নরম গলায় মাত্রায়ি জিজ্ঞাসা করল।

মাত্রায়ির মুখেও এসে থাপ্পড় পড়লো একটা। মাথা ঘুরে সেও পড়ে গেল। পাশাপাশি এ্যাণ্টনী আর রোক্কি দুজনে তাঁত বুনছিল। এ্যাণ্টনী মিস্ত্রীর দিকে লাফিয়ে এল, পেছনে রোক্কিও। এ্যাণ্টনীর মুখে গম্ভীরতার ছাপ। বিনয় নম্রতার বালাই না রেখে জিজ্ঞাসা করল—

'মিস্ত্রী, একটা মানুষকে কুকুরের মত কেন মারছো?'

'মানুষ কোথায়? নিমকহারাম মানুষ হয় কি করে? কুকুর তো।' চেঁচিয়ে বলে উঠল মিস্ত্রী।

ততক্ষণে মাত্রায়ি আর সাইমন উঠে দাঁড়িয়েছে। মাত্রায়ি জিজ্ঞাসা করল—

'কি নিমকহারামী করেছি আমরা?'

'ওরে কার নিমক খাচ্ছিস তোরা, জানিস্ ?'

'কার ? বলো, মিস্ত্রী'—পেছন থেকে বেলায়ুধন জিজ্ঞাসা করল।

'কি এতদিন তাহলে কার নুন না জেনেই খেয়ে যাচ্ছিস ?'

'জেনেই খাচ্ছিলাম। আমরা যা খাই তা সবই আমাদের পরিশ্রমের অন্ন।' জবাবটা ছিল এ্যান্টনীর।

'তোরও কি একটু দরকার নাকি ? নিমকহারাম কুকুর কোথাকার'—চীৎকার করে উঠল মিস্ত্রী।

'এত বয়স হ'ল। এখনও কুকুর আর মানুষ ঠিক করে না চিনতে পারলে'—ইতিমধ্যে হাত উঠে এসেছে মিস্ত্রীর। হঠাৎ রোক্কি পেছন থেকে তার হাত চেপে নামিয়ে আনল।

'কি হ'ল মিস্ত্রী ভাই ? কি হয়েছে ?' ঘাবড়ে গিয়ে সেখানে দৌড়ে এল বর্কি। ছাড়িয়ে দিল মিস্ত্রীর হাত। নিজে থেকেই মাফ চাইল মিস্ত্রীর কাছে।

'অবুঝ ছেলেপিলে সব, একেবারে অবুঝ ! মাফ করে দাও।'

'লাঠি দিয়ে সায়েস্তা করিনি, তবু এরা নিমকহারাম হয়ে উঠল।'

'ক্ষমা করে দাও মিস্ত্রী, ক্ষমা করে দাও'—অনুনয় জানাল বর্কি। আর কেউ কিছু বলল না। এ্যান্টনী 'হুঁ' করল একবার। রোক্কি তার হাত ডলে নিল একটু। একবার ঘুরে তাকাল বেলায়ুধন মিস্ত্রীর দিকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্রায়ি আর সাইমন। সে 'হুঁ' আওয়াজ আর দীর্ঘশ্বাস সমস্ত বোনা দড়ির মধ্যে যেন ভেসে আসতে লাগল।

রাত অর্ধেক কাবার হয়ে যাবার পর সেদিন এ্যান্টনী আর রোক্কি বাড়ী ফিরল। এলী আর বর্কি ছেলেদের পথ চেয়ে বসে ছিল। খাওয়া-দাওয়া সারার আগে ওদের যেন কিছু না বলে বর্কি সে অনুরোধ এলী জানিয়ে রেখেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর রোক্কি মাদুর পেতে বারান্দায় শুয়ে পড়ে। প্রদীপের আলোয় এ্যান্টনী পত্রিকা পড়ছে। বর্কি বারান্দায়

এল। উপরের চালার বাঁশ ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল। চুপচাপ। এলী এসে তার পেছনে দাঁড়াতেই এ্যাণ্টনী জিজ্ঞাসা করল—'মা বাবা তোমরা ঘুমাচ্ছো না কেন?'

'ঘুমাতে কি পারি? ছেলে বিগড়ে গেলে মা বাবার চোখে ঘুম আসে কি করে?'—শরীর কেঁপে উঠল বর্ক্কির। থেমে থেমে কথা বলছে সে।

রোক্কি উঠে পড়ে জিজ্ঞাসা করল—

'বাবা কি বলছ? আমরা কি দোষ করেছি?'

'মিস্ত্রীর হাতটা চেপে ধরলে কেন তুমি?'

'যখন মিস্ত্রী আমার বড় ভাইকে মারতে উঠেছে তখন কি আমার সেটা দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখা উচিত?'

'আর আমি মারতে এলে আমার হাতও কি চেপে ধরবে?'

'বাবা তুমি আমায় মারতে চাও তো মারো। তুমি আমায় মারো ধরো যাই কর, ভাই থামাতে আসবে না'—উঠে এসে এ্যাণ্টনী মাথা নীচু করে বাবার সামনে দাঁড়ায়।

সবেগে এগিয়ে এসে এলী বলল,

'তুমি চাও তো মারো, বকো যা খুশী করো তাতে কি? কিন্তু মিস্ত্রী আমার ছেলেদের মারবে তা বলে?'

'বাবা তুমি মারো, মারো আমাদের। আমরা টু শব্দটিও করবো না'—রোক্কিও বাবার সামনে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়।

কিন্তু কারুর মুখে আর কোন শব্দ নেই। চোখের জল মুছতে মুছতে বর্ক্কি ভেতরে চলে যায়। এলীও পেছন পেছন এলো।

রবীন্দ্রমশাইয়ের নারকেল দড়ির কারখানার সামনে তিনটে রাস্তা এসে মিলেছে। শহরের দিককার রাস্তাটা এ পর্যন্ত এসে দুভাগ হয়ে গেছে—একটা গেট উত্তর-পশ্চিমে আর একটা উত্তরপূর্বে। রাস্তার এই মোড়টায় চা-পান, কাপড়চোপড় আর দর্জির দোকান রয়েছে কয়েকটা। তার মধ্যে চায়ের দোকানটা ছিল কুট্টপ্পনের।

কুট্টপ্পনের চায়ের দোকানটা কিন্তু অন্যান্য চায়ের দোকানের চেয়ে একটু অন্য রকমের। চা খেয়ে এখানে খবরের কাগজ পড়া এবং কিছুক্ষণ বসে কথাবার্তা বলার সুবিধাটুকু পাওয়া যেত। কুট্টপ্পন কয়েকটা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার গ্রাহক। বই পড়তে সে ভালবাসে। কিছু বইয়ের সংগ্রহও আছে তার। শুধু তাই নয়, যারা চা খেতে আসত তাদের সে কথাবার্তায় জড়াতে চাইত। এতে তার ব্যবসার ক্ষতি হত না, বরং লাভই হত তাতে।

রবীন্দ্রমশাই এবং ধারে কাছে অন্যান্য কয়েকজনের কারখানার কিছু কিছু শ্রমিক কুট্টপ্পনের দোকানেই চা খেতে আসে। এ ছাড়াও শহরের ইংরেজ কোম্পানীর কারখানার কিছু শ্রমিক সন্ধ্যায় ফেরার পথে কুট্টপ্পনের দোকানে এসে চা খায়, পত্রিকা পড়ে ও কথাবার্তা বলে। এ্যান্টনী, রোক্কি, বেলায়ুধন, মাত্রায়ি, সাইমন, অচ্যুতন, জোসেফ—এরা সবাই রোজ সন্ধ্যায় এখানে আসে। কাগজের খবর এবং কারখানার মজুরীর ব্যাপারে কখনও কখনও অনেকক্ষণ পর্যন্ত এদের কথাবার্তা চলে। অনেক সময় এসব কথাবার্তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়ে দাঁড়ায়।

এ ধরনের তর্ক আলোচনা দুবার হয়েছিল,— একবার শঙ্কুর মা

মারা যাওয়ার দিন এবং অন্যবার যখন কারখানার ঢোকার পথে ভার্গবকে আটকে দেওয়া হয়। দোকানের সামনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলেও, দরজার ফুটো দিয়ে আসা আলোটা দেখা যায়। ভেতরকার অস্পষ্ট গুঞ্জনও শোনা যায়। শঙ্কুর মা মারা যাওয়ার দিন পুলিশ শঙ্কু, অচ্যুতন আর জোসেফকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে খুব মারধোর করেছিল আর কোন মামলা মোকদ্দমা না করে পরের দিনই ওদের ছেড়ে দিয়েছিল। সেদিনও মাঝরাত অবধি কুট্টপ্পনের দোকানে আলো দেখা গেছে, ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তা শোনা গেছে। এ্যান্টনী আর পদ্মনাভন কেবল চুপচাপ বসে। অন্যেরা চাপা গলায় কথা বলছিল। রোক্কির গলাটা কখনও কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে অবশ্য। সীমার মধ্যে থাকার ক্ষমতা তার ছিল না। সে রূঢ় হয়ে উঠছিল, 'আমরা ভয় পেয়ে চুপচাপ থাকলে পুলিশও এসে মাথায় চড়বে। আর যদি ইটের বদলা হিসেবে আমরা পাটকেল নিয়ে তৈরী থাকি, তাহলে পুলিশ মারতে আর এগুবে না।'

'তবে আমরা কিভাবে বোঝাবো যে মারামারির জন্য আমরা প্রস্তুত?'

জিজ্ঞাসা করল পদ্মনাভন।

'কিভাবে বোঝাব?'···গাল তাক করে জোরে থাপ্পড় বসিয়ে দেব। তবেই বুঝবে আমরা কি।'

'রোক্কি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?' বেলায়ুধন জিজ্ঞাসা করল।

'পাগল আমি নই, তারাই পাগল, যারা মার খায়। মার খেয়ে চেঁচানোটা পাগলামি নয়ত কি?'

মাথা নীচু করে পদ্মনাভন অসম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বলল—

'না তা হয় না, মার খাওয়াও চলে না।'

মুখ ঘুরিয়ে পদ্মনাভনের দিকে তাকাল এ্যান্টনী। ওর গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল—'ইটের জবাবটা যদি পাটকেলেই দিই তাহলে···'

'কি হবে দিলে' রোক্কি জিজ্ঞাসা করল।

'ধরে নাও যে খাঁড়ার সামনে তোমরা গলা বাড়িয়ে দিচ্ছো।'

'তাহলে এই মারধোরের হাত থেকে কেমন করে নিস্তার পাওয়া যাবে?' কথাটা সাইমন জিজ্ঞাসা করল।

ধীরকণ্ঠে পদ্মনাভন বলল—

'কি করব? আপোষ রফা করব আমরা। তাই করা দরকার।'

আরও উচ্চগ্রামে উঠল এ্যাণ্টনীর কণ্ঠস্বর—

'সেটাই ঠিক। তাই উচিত। নারকেল দড়ি ত হাওয়ায় উড়ে যাবে। মোটা দড়ি উড়বে না।'

ধীরে ধীরে পদ্মনাভন বলল—

'আমরাও দড়ির মতোই। আমাদেরও কাছির মত হতে হবে।'

'কি, সবাই ঐক্যবদ্ধ হব আমরা?' সাইমন জানতে চাইল। এবং সে কথার জবাব দিল মাত্রায়ি—

'কিভাবে এক হব আমরা?...তার উত্তর হল পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করে এক হতে হবে সবাইকে।'

'ওর প্রশ্নটা করার উদ্দেশ্য এই যে, সরু দড়ি কি নিজে থেকেই মোটা কাছিতে পরিণত হবে?' বেলায়ুধন বলল।

পদ্মনাভন ধীরে ধীরে বলল—

'সবাইকে মিলিয়ে এক করতে হবে। সেটাই প্রয়োজন। সরু দড়ি সব এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। এক করে সব পাকিয়ে নিতে হবে।'

'কিন্তু পাকাবেটা কে? প্রধান প্রশ্ন সেটা।' রোক্কি প্রশ্নটা করল। কেউ আর জবাব দিল না। মাথা নীচু করে বসে রইল সবাই। বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার ব্যাপার। সেটা বাঁধবে কে?

এক করতে হবে। এক করতে হবে। কিন্তু করবে কে সেটা?

নীরবতা ভেদ করে মাথাচাড়া দিল প্রশ্নটা। দোকানের ঘুলঘুলি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সেটা বাইরে।

'সবাইকে মিলতে হবে। আপোষে এক হতে হবে সবাইকে—' একটা আওয়াজ দানা বেঁধে উঠল। আশপাশের কারখানাগুলোতেও পরদিন গুঞ্জরিত হ'ল সে ধ্বনি। চায়ের এবং পানের দোকানেও তার অনুরণন শোনা গেল। মালিকমশাইদের কানেও পৌঁছাল তার কথা।

কিছুদিন কাটল। একদিন সকালে এ্যান্টনী, রোক্কি, বেলায়ুধন, মাত্রায়ি আর সাইমন কিভাবে ঐক্যবদ্ধ করবে সবাইকে ইত্যাদি আলোচনা করতে করতে কারখানা অবধি পেঁাছাল। কিন্তু অফিসের বারান্দায় কি ওটা ?

রোজকার নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে দল বেঁধে শ্রমিকরা সব দাঁড়িয়ে আছে। ওরাও এগিয়ে গেল সেদিকটায়।

বারান্দায় নোটিশবোর্ডে ইংরেজী টাইপ করা একটা নোটিশ লটকানো ছিল।

রোক্কি জিজ্ঞাসা করল—'কি এতে ?'

'হ্যাঁ'।

'কাগজটায় কি লেখা ?'

'হ্যাঁ'।

'ভিড় করে সবাই তোমরা এখানে দাঁড়িয়েছ কেন ?'—চীৎকার করতে করতে এসে একটা মিস্ত্রী পেঁাছাল সেখানে।

'কাগজটায় কি লেখা, মিস্ত্রী ?' প্রশ্ন করল বেলায়ূধন।

'কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

'কেন বন্ধ হবে কারখানা ?' মাত্রায়ি জিজ্ঞাসা করল।

'কারণ ছোট মালিকমশাইয়ের ক্ষতি হচ্ছে ব্যবসাতে।'

'বড় মালিকের যেখানে ঘরে লাভ আসছে, সেখানে ছোটজনের ক্ষতি হবে কেন ?'

'ওরে কেন আর কেমন করে—জিজ্ঞাসা করবার তুই কে রে ?'

'মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে পরিষ্কার কিছু বোঝা যাবে না মাত্রায়ি।

এসো ছোট মালিক মশাইকেই আমরা জিজ্ঞেস করি'—বলল বেলায়ুধন।

'হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করতে যাবি? তাহলেই মিলবে জবাব? এই দেখ্, লেখা রয়েছে যে ছোট মালিকের কাছে কোন নালিশ নিয়ে কেউ যাবে না।'

'তবে কার কাছে গিয়ে আমরা দুঃখ জানাব?' শৌরি বুড়ো প্রশ্ন করল।

'মালিককে কিছু বলা চলবে না। কিছু বলতে হলে আমাকে বলো।'

'বাঃ, তবে বলতে চাও যে মুর্গীপোষার ভারটা শেয়ালের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যাক্'—রোক্কি বলল।

রোক্কির দিকে ঘুরে দাঁড়াল মিস্ত্রী। উদাসভাব দেখিয়ে এ্যাণ্টনী জিজ্ঞাসা করল—

'তাহলে এটা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়েছে যে তালা পড়বে কারখানায়।'

'আর কি করা যাবে? লোকসান দিয়ে কি কারখানা চালানো যায়?'

'লোকসান লোকসান বলে চেঁচালেই হল?'

'লাভ ক্ষতির ব্যাপারে আর কে কথা বলবে? আর তোদের এবিষয়ে বলার অধিকারই বা কতটুকু?'

'বলার অধিকার ত······'ঘোষণাটুকু শেষ হল না রোক্কির।

'কি বলার অধিকার আছে মালিকের?' মাঝখান থেকে এ্যাণ্টনী জিজ্ঞাসা করল।

'তুই আবার কে রে?'

'মালিক যদি দিনকে রাত বলতে চান আমরা তাহলে মানব না মিস্ত্রী।'

'তুই না মানিস্, তোর বাপ মানবে—তোর বাপ! বোঝার বুদ্ধি চাই রে, বুদ্ধি।'

'না বুঝে কথাটা বলিনি মিস্ত্রী।'

'কি জানিস তুই, রোজ সূর্য উঠবে কি-না সেটা কে ঠিক করবে তা জানিস তুই?'

'কে সে?'

'তাই তো বলছিলাম যে বোঝার ক্ষমতা থাকা দরকার। সেটা ঠিক করবার ভার তো ঈশ্বরের। তবে কারখানায় লাভ হচ্ছে কি ক্ষতি হচ্ছে সেটা স্থির করবেন মালিক।'

সবাই চুপ করে রইল। একটা হাসির আভাষ উঁকি দিল এ্যান্টনীর চোখে-মুখে। জিৎ হল ভেবে মিস্ত্রী চারদিকে দেখে বলল—,

'মালিক কাকে বলে জানো? তিনিই ত আসল ভগবান। সেই ভগবানকে মেনে চললে তোমাদেরই মঙ্গল।' আবার একটু খৃষ্টান ধর্ম উপদেষ্টার মতো গলা করে মিস্ত্রী বলল—

'লোকসান হচ্ছে কারখানায়। তাই মালিক এটা বন্ধ করতে চাইছেন। বন্ধ হলে অনাহারে তোমাদের মরতে হবে। খেয়ে পরে বাঁচার মত টাকা পয়সা মালিকের ত রয়েছে। তবে ছেলেপিলে নিয়ে তোমরাই ক্ষিধে তেষ্টায় মরতে বসবে।'

কেউ কিছু বলে কিনা দেখে মিস্ত্রী আবার তার বক্তব্য শুরু করল—'মনে হয় লোকসান এড়াতে মালিককে এ কারখানা বন্ধ করতে হবে। তবে তোমরা যদি বল যে লোকসান পুষিয়ে দেবে তাহলে মালিকের পায়ে পড়ে অনুনয় করব যে এ কারখানা তিনি একেবারে যেন বন্ধ না করে দেন।'

কারো কোন প্রশ্ন রয়েছে কিনা বুঝে আবার বলতে লাগল মিস্ত্রী, 'তোমরা কেউ কিছু বলছো না কেন? কেন জিজ্ঞেস করছো না যে লোকসানটা কিভাবে পুষিয়ে দেওয়া যায়?'

'তুমি নিজেই সে প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে দাও না মিস্ত্রী'—বেলায়ুধন বলল।

'হ্যাঁ, আমি নিজেই জবাব দিচ্ছি। টাকা প্রতি আটআনা করে মজুরী কমিয়ে দেওয়া দরকার। মালিক তো মজুরী দিতে দিতেই শেষ, তোমরা কেউ কিছু বলছো না কেন? কি, মজুরী কমানোর ব্যাপারে তোমাদের মত আছে?'

হাসি চেপে এ্যান্টনী বলল—,

'তাহলে মিস্ত্রী, কারখানা বন্ধই হোক।'

'মালিক বন্ধ করে দিলে ক্ষতির কিছু নেই। তবে তোমায়ও অনাহারে মরতে হবে মিস্ত্রী।'

'আমি মরতে রাজী। বন্ধ হোক কারখানা।'

চেহারা বদলে গেল মিস্ত্রীর। ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাসি হাসতে হাসতে এ্যান্টনী ঢুকে পড়ল কারখানার ভেতরে। অন্য সবাই তার পেছনে গেল।

মাঝরাত অবধিও সেদিন ঘুমোয়নি রোক্কি। কেরোসিনের আলোয় দুঃখে নুয়ে পড়ে সে বসে রইল। মায়ের পাশে গুটিসুটি মেরে আন্না শুয়ে। তবে কি মজুরী কমবে? না কি বন্ধই হয়ে যাবে কারখানা—এসবই সে ভাবছিল। কোনও বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলছিল দুজনের মধ্যে। শেষে একজন বলল—

'কারখানা বন্ধ করবার কথাটা মজুরী কমাবার একটা ছুতো।'

'হ্যাঁ, তা হওয়া খুবই সম্ভব' রোক্কি কথাটা মেনে নিল। একটু ভেবে আবার বলল—

'হয়ত বা বড় মালিক মশাই জানেনই না এসব।'

'কি, ব্যাপারটা খামখেয়ালী বলে ভাবছো তুমি? বাপ আর ছেলের মধ্যে হয়তো আপোষেই ঘটছে সব।'

'একথা বলো না। বড় মালিক সাক্ষাৎ ভগবান।'

'কে ভগবান?' প্রশ্নটা করতে করতে উঠে এলো জোসেফবুড়ো। বারান্দায় বসে সে বলল—

'তুমি তো ভগবানও জানো না, ভূতও না।'

'জোসেফ ভাই, একথা বললে কেন?'

'কারণ কথাটাই ত তাই। বড় মালিক মশাইকে তো ছোট বেলা থেকে জানি। তার তোষামোদ মাখা কথাবার্তা শুনে মনে হবে ভগবানেরও বাবা উনি। যাক, পান তামাকটা তো দাও।'

এলী এসে সামনে পানের বাটা রেখে গেল। পান চিবোতে চিবোতে জোসেফ আবার বলতে লাগল—

'তুমি জান, কারখানা উনি কিভাবে শুরু করেছিলেন? সে সময় তাঁত বোনার কাজ করতাম, যখন চালু হল কারখানা। তাঁর বাবা লটারীতে একবার টাকা পেয়েছিলেন। সব মিলিয়ে চার পাঁচশ হবে। তাঁর কারখানা খোলার ইচ্ছে হল। তখন ত মাত্র গোয়াল ধরনের চালাঘর আর চারটে তাঁত ছিল। আর আজ যা অবস্থা তাতে মাসের পয়লা তারিখ থেকে বাগানে নারকেল পড়তে শুরু করলে ত্রিশ তারিখে গিয়ে তা শেষ হয়। থাকেন এঁরা বাংলো বাড়ীতে আর গাড়ী চড়ে ঘোরেন। এত সব এল কোথা থেকে।'

চোখ ড্যাবড্যাব করে এলী আর বর্কি তাকিয়ে ছিল। জোসেফের গল্প চলছিল—

'এখন এরা বলে লোকসানে চলছে কারখানা! বন্ধ করে দেবে কারখানা, মজুরী আর্ধেক কমিয়ে দেবে!'

সিঁড়ি বেয়ে এ্যাণ্টনী আর রোকি উঠে এলো। জোসেফ জিজ্ঞাসা করল—

'কি, আমার ওখানে মাত্রায়ি আর সাইমন এসে গেছে?'

'হ্যাঁ, একসঙ্গেই এলাম আমরা'—এ্যাণ্টনী জবাব দিল।

'তাহলে চলি এখন'—উঠল জোসেফ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কারখানা বন্ধ হওয়ার কথাটার কি হল?'

'বন্ধ হবে না কারখানা। মজুরী কমানোর এটা একটা অজুহাত!'

'আমিও তাই বলছিলাম'—বিজয়ীর হাসি হেসে এলী বলে।

'কি, মজুরী কমানোতে তোমরা রাজী হলে?'

'না, আমরা মোটেই রাজী হব না।'

'যদি কমিয়ে দেয়, তাহলে?'

'যদি আমরা একজোট হই— তাহলে তা কমাতে পারবে না'— দৃঢ় কণ্ঠে এ্যাণ্টনী বলল।

'কি, হবে সবাই একজোট?'

'থাকতে হবে এক হয়ে। মিলে মিশে চলতে হবে'—এ্যাণ্টনীর স্বর উচ্চগ্রামে উঠল।

'হ্যাঁ'—তার ঘরের দিকে এগোতে এগোতে জোসেফ বলে।

[6]

জলভরা চোখে শশব্যস্তভাবে এলী এগিয়ে এল বর্কির দিকে। বাঘিনীর মতো গর্জে উঠল সে—

'কি, মেরেছে? আমার ছেলেদের মেরেছে?'

'একটু শান্ত হও, এলী। আমি নিয়ে আসছি ওদের'—বৌকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

'নিয়ে এসো। আমার এ্যাণ্টনী ও রোক্কিকে নিয়ে এসো'— আবার সে গর্জে উঠল।

'বাবা'—কাতর কণ্ঠে বাবাকে ডাকতে ডাকতে আন্না ফুঁপিয়ে উঠছিল কান্নায়।

'মা, আমি গিয়ে ডেকে নিয়ে আসব। এখন শান্ত হও।'

'নিয়ে এসো আমার ছেলেদের। বলো গিয়ে তুমি তোমার ভগবানকে যে আমার ছেলেদের ধরে নিয়ে গেছে পুলিশের দল।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গলির রাস্তা ধরে বর্কি হাঁটতে শুরু করে।

'আমিও···আমিও যাচ্ছি', এলী ছুটল বঙ্কির পেছনে পেছনে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। রবীন্দ্র মশাইয়ের বাংলোর গেটের কাছে একটা চৌকিদার দাঁড়িয়ে। আগে ত কখনও এরকম ছিল না। আগে এলী আর পিছনে বঙ্কি। যখন ওরা ভেতরে যেতে চাইল, ভারী গলায় চৌকিদারটা শাসিয়ে উঠল—

'খবরদার! ভেতরে যাবে না!'

এলীর পা বাড়ানোই ছিল। সে পিছু না হটেই জিজ্ঞাসা করল—

'যাবে না? এটা কার হুকুম?'

'আপাতত আমার হুকুম! থাম এখানে!'

'যদি ভেতরে যাই?' গম্ভীর ভাবে বঙ্কি জিজ্ঞাসা করল।

'যাই?···আমি দেবই না যেতে'—কোনও রকম ইতস্ততঃ না করেই চৌকিদার জবাব দিল।

'আমি বঙ্কি-বঙ্কি। মালিককে যে ভগবান মনে করে, আমি সেই বঙ্কি।' 'তা তুই বঙ্কি হ' আর যেই হ' রাস্তার ওদিকে সরে যা' —ঘৃণাভরে চৌকিদার বলল।

'আমি মালিককে ভগবান মনে করি।'

'মালিক ভগবানের সমান এ মনে করলে বেশীটা কি হল? ছেলেদেরও ত' সেটা মনে রাখা দরকার। তাই না?'

'ভগবানেরও ত বোঝা উচিত যে এরা গরীব, তাই নয় কি?' এলী গদগদ ভাবে জিজ্ঞাসা করল।

'এই পাগলী, চুপ কর্! আমিই বোঝাচ্ছি'—বঙ্কি ধমকে দিল এলীকে। আবার সে চৌকিদারকে বলল—

'আমার মালিকের সঙ্গে দেখা করে আমার দুঃখের কথা আমি তাকে জানাতে চাই। তুমি ভাই গিয়ে বলবে বঙ্কি আর এলী বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'সব পথ দেখ্' চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল চৌকিদার।

তবুও বিশ্বাস হচ্ছিল না বঙ্কির। সে মালিককে ভগবান মনে

করে। কিন্তু নিজের দুঃখের কথা তাকে জানাতে পারবে না।
ব্যাকুল হয়ে মিনতি জানাল—
'আমার এ্যাণ্টনী ও রোক্কিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। দেখা করে মালিককে আমার দুঃখ জানাতে এসেছি। দয়া করে আমাকে ভেতরে ত যেতে দাও!'

'সরে যাও এখান থেকে'—চৌকিদারের গম্ভীর গলা শোনা গেল।

'ছেলেদের সঙ্গে দেখা না করে আমরাও নড়ছি না এখান থেকে' — এবার এলীর গলা শোনা গেল।

'তুমি এদিকটায় দাঁড়াও। আমি দেখি একটু ভেতরে'—বর্কিকে সরিয়ে এলী নিজেই এগিয়ে গেল।

চৌকিদারের লৌহ কঠিন হাত গিয়ে পোঁছাল বর্কির ঘাড়ে। সঙ্গে একটা জোর ধাক্কা আর পায়ের লাথি! কনুইয়ে ভর দিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ল বর্কি!

'মার মার! আমায়ও মার!' গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল এলী। চৌকিদারের লোহার হাতের চাপে এলীর হাতও পিষ্ট হল। তারপর আর এক ধাক্কা। ব্যস্, এলীও চিৎ হয়ে পড়ল রাস্তার উপর। চারিদিক থেকে রাস্তায় লোকজন এসে জড়ো হল। কিন্তু কেউ কাছে এল না। কেউ কিছু বলল না। হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল বর্কি। সাহায্য করে সে-ই তুলল এলীকে। 'হায় প্রভু!' দর্শকেরাও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চৌকিদার তার বক্তব্য শুরু করল—

'ছেলেরা কারখানার ভেতরে ঢুকে মিস্ত্রী আর অফিসারদের মারধোর করেছে। এখন মা বাপ এরা এসেছে মালিককে পেটাবার জন্য।'

শুনতে লাগল সবাই। কেউ কিছু বলল না।

বাংলো বাড়ীর দিকে তাকাল বর্কি। সেখানে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে কেউ তাকিয়ে ছিল। চীৎকার করে বর্কি বলল—

'কে দাঁড়িয়ে ওখানে? মালিক মশাই?'

রাগ, অবজ্ঞা আর দুঃখ মেশানো তার কণ্ঠস্বর।

এলীই বক্কির প্রশ্নের উত্তর দিল—

'তোমার ভগবান! হ্যাঁ, ভগবানই ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন।'

'চলো যাই এবার আমরা'—এলীর হাত ধরে এগোতে শুরু করল বক্কি।

'যা, এবার গিয়ে পুলিশের ওখানে হুমড়ি খেয়ে পড়'—হাসতে হাসতে চৌকিদার বলল।

সবই দেখছিল কৌচ্চুন্নি! সে এ সময় বক্কিকে জিজ্ঞাসা করল—

'তুমি এখন কোথায় যেতে চাও?'

'এ্যান্টনী আর রোক্কিকে পুলিশেরা থানায় ধরে নিয়ে গেছে।'

'তোমারও সেখানে যাওয়া উচিত।'

'গেলে কি হবে কিছু?'

'যেতে পারো····তবে গেলে ফিরে আসতে পারবে না। খুনোখুনি চলছে এখানে। পিটিয়ে মারছে। লোহার পুলটার কাছে গেলেই চীৎকার আর চেঁচামেচি শুনতে পাবে।'

'কি, মেরেছে? মেরেছে আমার বাছাদের?' পাগলের মতো ছুটতে শুরু করল এলী। বক্কিও ছুটল পেছনে পেছনে।

থানার কাছে রাস্তায় দাঁড়ানো একটি লোক চেঁচিয়ে বলল ওদের—

'যেও না বক্কি ভাই, ওদিকে যেও না।'

বক্কি আর এলী তা শুনল না। কোন কথাই তাদের কানে যাচ্ছিল না।

'মেরেছে? আমার বাছাদের মেরেছে?'—গেট খুলে থানার ভেতরে চলে গেল এলী।

'মেরেছে! আমাদেরও মেরেছে!' বক্কিও চলে এল গেটের এপাশে। ওদের ঘিরে ফেলল তিনটি সিপাই। থানার ভেতর থেকে একটা আদেশ ভেসে এল—

'এদের ধরে এখন নালায় ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

তুলে ধরা হল এলী ও বর্কিকে। গেট ডিঙ্গিয়ে উঁচু থেকে থানার সামনেকার নালায় এসে পড়ল ওরা; রাস্তার চলমান জনতা দেখল দৃশ্যটা। কিন্তু কেউই কিছু বলল না। বলবার কারো সাহসই ছিল না।

হাতটা ধরে বর্কিকে ওঠাল এলী। ওর একটা পা ভেঙ্গে গেছে। এলী ঠেকা দিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল বর্কি।

কাঁদবার শক্তিটুকুও হারিয়েছিল এলী। কোনও রকমে বর্কিকে সামলে ধরে চলে বাড়ীর গলি রাস্তা অবধি এসে পৌঁছাল। বারান্দার প্রদীপের সামনে গুটিস্থুটি 'দ' এর মত আন্না পড়ে। জোসেফ খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখছে। বেলায়ুধনের মা থুত্‌নীতে হাত রেখে দালানে বসে।

দরজার কাছে পৌঁছে এলী চেঁচিয়ে বলল—

'ধর, এগিয়ে এসে ধর।'

সবাই ছুটে এল। একসঙ্গে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল সকলে—

'কি, মেরেছে?'

'বাবা!' দৌড়ে এসে আন্না বর্কির গলা জড়িয়ে ধরল।

কেঁদে উঠল সবাই। গেটের থেকে তুলে বর্কিকে বারান্দায় শোয়ানো হল।

'কি, আমার ছেলেদের মেরেছে?' জোসেফ জিজ্ঞাসা করল।

'আমার ছেলেটাকেও মারল? হায়, ওই সবেধন নীলমনি আমার'—বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু করল বেলায়ুধনের মা।

কেউ কথা বলছে না। বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকা বর্কির পাশে এলী আর আন্না চোখ বুঁজে বসে।

এই সময় ছ'সাতজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। চমকে উঠে সবাই তাকিয়ে দেখল। অচ্যুতন, শঙ্কু, পদ্মনাভন, জোসেফ, পপ্পন এসেছে।

এরা ছাড়াও রোগামত আর একজন ছিল। সে সবার পেছনে দাঁড়িয়ে।

'আমার ছেলে কোথায়?' কাঁদতে কাঁদতে বেলায়ুধনের মা জিজ্ঞাসা করল।

'আমার ছেলেটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে?' জানতে চাইল জোসেফ।

বর্কির পাশ থেকে উঠে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আন্না জিজ্ঞাসা করল—'আমার ভাই দুজন ফিরে আসবে তো?'

'সবাই ফিরে আসবে'—জবাব দিল পদ্মনাভন। সে আরও বলল—'শুনেছি যে এ দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে না। এদের ছেড়ে দেওয়া হবে—হয়ত বা কাল পরশুর মধ্যেই।'

'কি, খুব পিটিয়েছে এদের?' জোসেফ জানতে চাইল।

এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিল না। আবার কাঁদতে কাঁদতে আন্না প্রশ্ন করল—'আমার ভাইদেরও মেরেছে?'

রোগা লোকটি এগিয়ে এল। আন্নার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'বোনটি আমার, কেঁদো না। কাল আসবে ওরা।'

'এ কে?' পদ্মনাভনকে জিজ্ঞাসা করল জোসেফ।

'এ আমাদের সাহায্য করবার জন্যই এসেছে।' জোসেফ বলল—'লেখাপড়া জানা লোক। গরীব-দুঃখীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে।'

রোগা লোকটি বর্কির পাশেই বসেছিল। এলীকে জিজ্ঞাসা করল—'পা টা কি ভেঙ্গে গেছে?'

'হ্যাঁ,'—কেবল এই 'হ্যাঁ' বলার ক্ষমতাটুকুই মাত্র এলীর ছিল।

'ওঁকে এখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'একটা খাটিয়া চাই'—জোসেফকে বলল পদ্মনাভন।

জোসেফ ও পপ্পন গিয়ে জোসেফের ঘর থেকে একটা নারকেল দড়ির খাটিয়া নিয়ে এল। সবাই মিলে বর্কিকে তার উপর শোয়ায়।

শঙ্কু, পপ্পন, জোসেফ ও অচ্যুতন খাটিয়া উঠিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করল—সিঁড়ি দিয়ে নেমে গলি দিয়ে চলে গেল ওরা।

*   *   *   *

নিঃঝুম, নিবিড় অন্ধকার। কোথা থেকে যেন একটা বাতাস বইতে শুরু করেছে। স্পন্দন—কম্পন বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু অন্ধকার ঘুচছে না। একটা নতুন জাগরণ! একটা চৈতন্যের অনুভূতি। ভিতরের একটা তীব্র আবেগ!

কি করে যে এসব সম্ভব হল, কেউই বুঝতে পারে না। কারখানার তাঁতেও ঐ স্পন্দনের চিহ্ন। চায়ের দোকানে আর চৌরাস্তার মোড়ে এই চৈতন্য, এই আবেগ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আজ এরা, কাল আমরা—একযোগে ফিসফিসিয়ে উঠল সবাই। এ্যাণ্টনী, রোক্কি, মাত্রায়ি আর সাইমন কাহিল হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে হাজত থেকে বেরিয়ে আসে।

ময়না তদন্তের পর বেলায়ুধনের মৃতদেহ তার বন্ধুদের কাছে দেওয়া হল। ডাক্তার সার্টিফিকেট দিল যে, সে আত্মহত্যা করেছে।

বেলায়ুধনের বোনেরা মৃতদেহ নিল। তার মা মারা যাওয়ার খবরটা পেয়েই অজ্ঞান হয়ে গেছে।

'একদম পিটিয়ে মেরেছে'—চুপচাপ নিজেরা বলাবলি করল সবাই। তবে ডাক্তারের সার্টিফিকেটটা ছিল আত্মহত্যার। তাই নিরক্ষর গ্রাম্য জনের কথা কে আর বিশ্বাস করতে যাচ্ছে?

তবুও নিবিড় আঁধারে চঞ্চল বাতাসের মত এই পিটিয়ে মারার কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই হাওয়ায় একটা কথা গুঞ্জরিত হয়ে উঠল—'আজ এরা, আমরা কাল।'

বিকেল পাঁচটা বেজে গেছে। সিটি বাজল কারখানায়। গেট ধরে নদীর মত ছোট ছোট জনস্রোত বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে। ঝিমধরা চোখ আর অস্থিচর্মসার সব চেহারা!

কিন্তু সেই ঝিমোনো চোখে সেদিন চৈতন্যের স্ফুরণ আর তোবড়ানো গালে আবেগের আভাষ উদ্ভাসিত।

কারখানার গেট থেকে বেরিয়ে আসা প্রবহমান নদীর মত সেই জনস্রোত আপন লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছিল। সন্ধ্যার আগেই বেলায়ুধনের ঘরের চারপাশ ঘিরে এক জনসমুদ্র দেখা গেল। ঘরের বারান্দায় বেলায়ুধনের কাটা-ছেঁড়া মৃতদেহটা মাথা পা একত্র করে শোয়ানো ছিল। সেই মৃতদেহের পাশে এলীর কোলে মাথা রেখে চোখ বুঁজে বেলায়ুধনের মা শুয়ে।

উঠানে একটা বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনে সেই রোগা লোকটি বলছিল—

'বন্ধুগণ (কমরেডস্), শ্রমিক অধিকার এবং স্বাধীনতার শহীদ কমরেড বেলায়ুধনের শোকযাত্রা এখনই শুরু হবে।'

রাস্তার সমবেত জনতার একজন পাশের আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'বন্ধু বলে এ বলছে কেন ?'

'কারণ কথাটা সেরকমই। অর্থাৎ সবাই আমরা পরস্পরের বন্ধু।'

অনেকেই এ প্রশ্ন করল, বহুজন জবাবও দিল। তবে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। রোগা লোকটি মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে উঠল—

'পুঁজিবাদ নিপাত যাক !'

এ্যান্টনী, রোক্কি, মাত্রায়ি, সাইমন, পদ্মনাভন, অচ্যুতন আর পপ্পন সে আওয়াজে গলা মেলাল। কিন্তু সেই জনসমুদ্রে কোন প্রতিধ্বনি শোনা গেল না। জোর দিয়ে সেই রোগা লোকটি বলল—

'পুঁজিবাদ শ্রমিকদের শোষণ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই আমাদের বন্ধু বেলায়ুধনকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। তাই পুঁজিবাদ নিপাত যাক্।'

এসময় জনতার দিক থেকে আওয়াজ উঠল—

'পুঁজিবাদ নিপাত যাক্।'

উঠানে দাঁড়ানো লোকদের একজন অন্যজনের কানে কানে বলল —'এরা বলছে পুঁজিবাদ খতম কর। কথাটা ঠিক! তাই না?'

'তাছাড়া আর কি? যেভাবে বেলায়ুধনকে মেরেছে, সেভাবে পুঁজিপতিদেরও পেটানো দরকার। সেটাই প্রয়োজন।'

বেলায়ুধনের শবাধার ওঠানো হল। গলি ধরে আস্তে আস্তে সেটা বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'পুঁজিবাদ নিপাত যাক' আওয়াজ জোরদার হয়ে মিলিয়ে গেল। চোখ খুলল বেলায়ুধনের মা। আবার বন্ধ হয়ে গেল। এলী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কাশি! রোক্কি কাশতে শুরু করেছিল। কেশে থুথু ফেলল—দেখা গেল সেটা রক্ত।

[7]

বর্কি হাসপাতালে। তার ভাঙ্গা পা জুড়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার বলেছে সে শীঘ্রই সেরে উঠে ঠিকমত চলাফেরা করতে পারবে। কিন্তু যদি বা শারীরিক আঘাতটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, মনের আঘাত কাটানো অসম্ভব মনে হচ্ছে।

এক সময় যখন স্ত্রীকে নিয়ে নিঃসহায়ভাবে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন রবীন্দ্রমশাই তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন, চাকরীও দিয়েছিলেন। তাছাড়া সে ও তার স্ত্রী মালিকের ধর্মও গ্রহণ করেছিল। সব মিলিয়ে সে মনে করত এই মালিকই তার প্রত্যক্ষ ভগবান। কখনো নিজের ছেলে মেয়ে যে-ই হোক তার মালিকের নিন্দা করলে সে সহ্য করতে পারত না। এমন মালিক অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে দেখা করে যখন সে ছেলেদের অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করার জন্য যাচ্ছিল, তখন কিনা চৌকিদার বলে যে

সে ভেতরে যেতে পারবে না। এ কথা সে কেমন করে কল্পনা করবে? তবে আশ্চর্য লাগছিল যখন তাকে আর তার স্ত্রীকে চৌকিদার রাস্তায় ফেলে দিল, তখন মালিক স্বয়ং দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলেন! ঘটনাটা এত প্রত্যক্ষ, তবুও যেন সে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না! তার মনে হল সে সময় শয়তানই যেন ভগবানের রূপ ধারণ করে দাঁড়িয়েছিল। অথবা যাঁকে সে ভগবান বলে জানত সেই শয়তান! অসহ্য দুঃখ, ক্ষোভে আর ঘৃণা ভরে এলী যে কথাটা বলতে চেয়েছে তাই যেন এখন তার কানের কাছে গুনগুনিয়ে উঠল—

'তোমার ভগবান! হায় ভগবান, এভাবে এখানে নিশ্চল দাঁড়ানো!'

পুরোপুরি সজ্ঞান না হলেও, তাড়াতাড়ি সে থানা অবধি গিয়েছিল। যখন পুলিশ তাকে নালায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তখন সে প্রায় অজ্ঞান। তাই পা ভাঙ্গার ব্যাপারটা গোড়ায় বুঝতে পারেনি, তাছাড়া পায়ের কথা ভাবেও নি। হাসপাতালের খাটে শুয়ে তার তন্দ্রা আসছিল। এলীর সেই কথাটা একটানা গুনগুনিয়ে উঠেছে তার কানে। দোতলার সেই জানলা, থেকে থেকে শয়তানের দৃষ্টিটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে; একটা বিশ্বাস ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে আর এমনভাবে সেটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে যে তাকে কোনও ভাবে ধরে রাখা বা থামানো মোটেই অসম্ভব। কেবল তার নিজের নয়, সমগ্র পরিবারের পক্ষেই এটা ক্ষতিকারক। কি শোচনীয় পরিস্থিতি।

এলী আর আন্না বর্কির মাথা ও পায়ের কাছে বসে। এ্যাণ্টনী আর রোক্কিকে বার বার বলার পর তবে ওরা বাড়ী আসত। এমনভাবে দিন বিশেক কাটবার পর বর্কিকে হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে নিয়ে আসা হল। এখন তার চলাফেরায় তত অসুবিধে নেই, তবে তার নিজেরই তেমন চলাফেরা করতে কিংবা বিছানা

ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করত না। সব সময়ই মাত্বরে শুয়ে থাকে, সারাক্ষণই যেন আধো-জাগা অবস্থায় রয়েছে।

এসময় একবার রবীত্নমশাইয়ের কারখানার মিস্ত্রী জোসেফের ওখানে এল। তখন মাত্রায়ি আর সাইমন সেখানে ছিল না। জোসেফ উঠে এসে যত্ন করে মিস্ত্রীকে বসাল। বিজয়ীর মত মিস্ত্রী বলল—

'এখন বুঝলে ত?'

'হ্যাঁ, বিলক্ষণ বুঝেছি। এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তোমরা বড় নিষ্ঠুর।' 'আর বোঝার বাকী রইল কি, জোসেফ ভাই?'

'সত্যি, আর বোঝবার কি আছে, মিস্ত্রী? আমার ছেলে ত্নটোকে পিটিয়ে তক্তা করে দিয়েছো। আর শেখা বোঝার এখন রইল কি?'

'তুমি জান, কেন ওদের মেরে ফেলিনি? মালিক হুকুম দিলে পিটিয়ে মারতাম বৈকি, তবে সে রকম হুকুম তো উনি করেন না। বুঝলে, কেন?'

'কেন?'

'কেন?···কেনর কারণটা এই যে সবাই আমরা খৃষ্টান, একই সত্যে বিশ্বাস করি। তাই মালিক মেরে ফেলার হুকুম দিতে কুণ্ঠিত। বুঝলে?'

'তবে মারলে কেন ওদের ধরে?'

'কেন মারা হল? মেরেছে তো ভগবান! ভগবানের বিরুদ্ধে এরা সব কথা বলেছে। বুঝলে এবার?'

একথা শুনতে শুনতে সাইমন এসে ঢুকল। সে জিজ্ঞাসা করল—

'মারেন যিনি তিনি আবার কোথাকার ভগবান?'

'শুনলে তো জোসেফ ভাই, ভগবানের নিন্দা করছে!' মিস্ত্রীর গলা উচ্চ গ্রামে উঠল।

'এই খোকা, তুই চুপ কর্!'—ছেলেকে শাসিয়ে দিল জোসেফ।

মিস্ত্রীও অন্যমূর্তি ধরল। আহ্লাদের সুরে বলল—

'কেবল ঝগড়াই কর তোমরা। তাই অবুঝের মত কথাবার্তা বল। আসলে ত মালিকই ভগবান। কেন, জানো না সেটা? যা কিছু তিনি বলেন, সবই ভগবানের কথা বুঝলে?'

'তাহলে মিস্ত্রী ভাই, মালিকের সব বাণী বেদের মত ছাপিয়ে বাঁধিয়ে রাখ!'

'এই, বললাম না তোকে চুপ করে থাক্'—আবার ছেলেকে ধমকাল জোসেফ।

'যাক্ এসব। বলো তোমরা এখন কেন কারখানার কাজে যাচ্ছো না?'—হাসতে হাসতে মিস্ত্রী সাইমনকে জিজ্ঞাসা করল।

'কেন যাই না?......মিস্ত্রী ভাই নিজেই কি সে কথা জানো না?'

'আমি কি করে জানব কেন তোমরা আসো না?'

'বাঃ এমন কথা বলছ যেন আকাশ থেকে পড়লে! পুলিশেরা পিটিয়ে আধমরা করল, আর তুমি কিনা জিগ্যেস করছ—কেন আসো না তোমরা?'

'এই, চুপ কর্ তুই!' আবার জোসেফ ছেলেকে শাসাল।

'বাবা, আবার যেতে বলছে কেন জান, যাতে আরেকবার ধরে পিটতে পারে।'

মিস্ত্রী বলল—

'আসতে বলছি এজন্য যে এসে কাজকর্ম কর। আর কাজ করলেই তবে মজুরী পাবে। যে কাজ করবে, পয়সা কামাবে আর নিজের মত চলবে, সে যদি বোকার মত কথা বলতে থাকে আর ভগবানের নিন্দা করতে থাকে ত...?'

'সামনে নিজের মত চলেও মার খেতে হয়। এ চলবে না মিস্ত্রী!' দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল সাইমন।

'আমি কি বলেছি যে তোমরা পড়ে মার খাও? মালিকমশাই যখন শুনলেন যে তোমরা অনাহারে রয়েছো, তখনই তো দয়া করে

আমায় এখানে পাঠালেন। তিন-চারদিন বাদে জাহাজ আসছে। তখন মাল পাঠাতে হবে।'

'হ্যাঁ', ব্যঙ্গের হাসি হাসল সাইমন।

'মিস্ত্রী ভাই, তুমি এখন যেতে পার। আমরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে নিই আগে, তারপর দেখা যাবে।'

'শলা-পরামর্শের এতে কি আছে? কার সঙ্গেই বা করবে?··· ইষব জাতের বুদ্ধি নিয়ে তাদের হাত ধরে চললে আর রক্ষা নেই তোমাদের, এ কথা আমি বলে দিচ্ছি। খৃষ্টানদের একটু পয়সা হতে দেখলে ইষবদের কিন্তু চোখ টাটায়।' 'তা হোক মিস্ত্রী ভাই, এখন যেতে পার তুমি। আমরা ভেবে চিন্তে দেখি ব্যাপারটা।'

'কাল কি তবে আসব?'

'হ্যাঁ'।

মিস্ত্রী চলে গেল। জোসেফ বলল—

'ঠিকই বলেছে লোকটা। খৃষ্টান বলেই মালিক আমাদের ওপর দয়াপরবশ হয়েছেন।'

'আশ্চর্য করলে তোমরা! আসল ব্যাপারটা হ'ল যে জাহাজ এলে মাল পাঠাতে হবে। তাই এই খৃষ্টধর্মের কাঁদুনী গাইছে।'

জোসেফ আর কিছু বলল না।

* * * *

অর্ধেক রাত অবধি কুট্টপ্পনের চায়ের দোকানে আলো জ্বলছিল। সেই রোগা লোকটি এবং এ্যান্টনী, রোক্কি, সাইমন, মাত্রায়ি আর পদ্মনাভনের গলা শোনা যাচ্ছিল।

রোগা লোকটি বলল—

'শ্রমিকের জাত নেই, ধর্ম নেই। আলাদা ভগবান বা দেশও নেই।'

'এসবই পুঁজিপতিদের জন্যে। ভগবান তো পুঁজিপতিদের হাত ধরে রয়েছেন।'

'ঘুষি মেরে এদের সায়েস্তা করা দরকার। সেটাই উচিত।'

এ্যান্টনীর গম্ভীর স্বর শোনা গেল—

'ঘুষি-টুষি সব পরের ব্যাপার। এখন ভাবতে হবে কাজ করতে যাওয়া হবে কিনা।'

রোগা লোকটি পরামর্শ দিল—

'কাজে যেতে হবে সবাইকে। কাজ করার কারণ এ নয় যে মালিক দয়ালু কিংবা আমরা খৃষ্টান। ইষব হলেও কাজ করতে হবে। মালিকের যেমন কাজের প্রয়োজন তেমনি শ্রমিকেরও। তাই সবার কাজে যাওয়া দরকার।'

শেষে স্থির হল কাজে যাবে সবাই।

* * * *

রাত অর্ধেক পেরিয়ে যেতে আন্না আর এলী ঘাবড়ে গেল। তারা সেদিনটা উপবাসে কাটিয়েছে। তার জন্য কোনও কষ্ট হয়নি। তাদের এ্যান্টনী আর রোক্কি যেন ফিরে আসে, সেই প্রার্থনাই করছিল তারা। আধজাগা অবস্থায় বর্কি থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছিল—

'কি, এল ওরা ?'

উঠে এসে গলির মুখে দাঁড়াল এলী আর আন্না। প্রশ্ন করল আন্না, 'মা, রাত তো অর্ধেক গড়িয়ে গেল, তবু ওরা আসছে না কেন ?'

'হ্যাঁ মা, এসে যাবে।'

'এবারেও কি পুলিশেরা······'

'না মা, না! ঠিক আসবে।'

'কি, এসে গেছে ওরা ?' ঘরের ভেতর থেকে বর্কি প্রশ্ন করল।

'এসে যাবে এখনই'—এলী বলল।

জোসেফের ঘরে আলো জ্বলছিল। গলিতে এগিয়ে এল জোসেফ। সে জিজ্ঞাসা করল—

'এসে গেছে ?'

'না। আসেনি ত।'

'তোমরা জানো, মিস্ত্রী আমার ওখানে এসেছিল ?'

'না তো··· ··। কেন এসেছিল সে ?'

'বলতে এসেছিল যে কাজে যাওয়া দরকার।'

'আবার ?'

'মনে হচ্ছে সবাই মিলে চিন্তা-ভাবনা করার পর একটা স্থির সিদ্ধান্ত হবে।'

'তাই উচিত।'

'কি, এল ?'—বর্ক্কি আবার ভেতর থেকে জিজ্ঞাসা করল।

'এখনই আসবে'—এলী চেঁচিয়ে বলল।

জোসেফ বলল—'মিস্ত্রী বলছিল আমরা খৃষ্টান, তাই কিল ঘুষি আমাদের মারে নি। নয়ত' পিটিয়ে মেরে ফেললে আর কেই বা দেখতে আসছে।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।'

'কি হল, তোমরা দুজনে গলিতে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?' জিজ্ঞাসা করতে করতে অ্যাণ্টনী আর রোক্কি এসে পৌঁছাল। পিছন পিছন মাত্রায়ি আর সাইমনও।

'আরে, কি এলি তোরা ?' বর্ক্কি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ এসে গেছি—এসে গেছি······'

'আয় বাবা, ভেতরে আয় তাড়াতাড়ি।'

এ্যাণ্টনী আর রোক্কি ভেতরে এল। এলী আর আন্না তাদের পেছনে।

[8]

কুঞ্জু শঙ্করণ মশাইয়ের নারকেল দড়ির কারখানা কেবল নিছকই কারখানা নয়, অনেক রকম ব্যবসার কেন্দ্র। সেখানে নারকেল ছোবড়া ছাড়ানোর, ছাড়ানোর পর চরকায় কেটে সুতো তৈরী, দড়ি পাকানো যাবতীয় কাজ হতো। মুদির দোকান আর চায়ের দোকানও ছিল। পরে নারকেল দড়ির পাপোষ-মাদুর বোনার কাজও চালু হয়।

গোড়ায় ব্যবসাটা ছিল কাঁচা নারকেলের ছাল কিনে পচিয়ে বিক্রীর ব্যবসা। পরে চেষ্টা চললো কিভাবে শ্রমিকদের পয়সাটা আবার নিজেদের বাক্সে তোলা যায়। শেষটায় চা ও মুদির দোকান খোলা হয়। মালিক তাঁর শ্রমিকদের বোঝালেন যে তাদের মজুরীটা নুন-লঙ্কা, চাল চা ইত্যাদি প্রকারে দেওয়া হবে এবং যারা এ শর্তে চাকুরীতে নারাজ, তাদের আর কাজে আসার দরকার নেই। চাকরীর এই শর্তটিকে অস্বীকার করবার মত সাহস কারও ছিল না। যাতে সেরকম কেউ না করে তাই গোড়াতেই মালিক জিজ্ঞাসা করতেন—

'তোমার পয়সার প্রয়োজন কেন? চাল ডাল কেনার জন্যেই তো? আর সে সঙ্গে চা-ও খাবে। তাই আমি মুদিখানা আর চায়ের দোকান খুলেছি। আগে চাল ডাল কেনো, পরে চা খাও। হ্যাঁ, এর পরেও কিছু মজুরী উদ্বৃত্ত হলে নগদ পয়সায় সেটা নিয়ে নাও।'

তবে আসলে ব্যাপারটা এমনই দাঁড়াতো যে, মুদিখানা থেকে চাল ডাল নিয়ে আর চায়ের দোকানে চা খেয়ে শ্রমিকদের কোন পয়সা হাতে থাকত না।

এখন মালিক চাইলেন যে, ছিবড়ে বেচার চেয়ে দড়ি পাকানোর ব্যাপারটায় লাভ বেশী। ছোবড়া ছাড়ানো, দড়ি পাকানোর সব

লোকেরা এলে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আর সেজন্য চাল ডাল কেনা বা চা পানের দরুন মুনাফাটাও বেড়ে যাবে। তাই ছোবড়া ছাড়ানো আর দড়ি পাকানোর কাজও শুরু হ'ল। সে সঙ্গে মুদিখানা এবং চায়ের দোকানের আকার ও আয়তন বাড়ানো হ'ল। তবে সব জিনিষের দাম অবশ্য বাড়ল না। মালিক মশাই ছোবড়া ছাঁটাই, ছাল-ছাড়াই আর দড়ি পাকানোর শ্রমিকদের বলতেন—

'দেখো, আলপ্পুষার বাজারে চালের দর বেনোজলের মত হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। লঙ্কার দরে আগুন লেগেছে। আর হ্যাঁ, চায়ের অভ্যেসটা সবাই ছেড়ে দিলেই ভালো, কারণ গুঁড়ো চা কিনতে গিয়ে তো জমি বন্ধক দেবার অবস্থা।

ওই কুঞ্জু শঙ্করণ মশাইয়ের দোকানে সব জিনিষের দামই সব সময় বেশী। তার বিচারে কোন জিনিষের দামই কোনও কালে কমা সম্ভব নয়।

কুঞ্জু শঙ্করণের খাজাঞ্চি কর্মচারীর বৌ কালিকুট্টি। নারকেলের কাঁচা ছোবড়া কেনা থেকে দড়ি পাকানোর হিসাব আর সে সঙ্গে মুদিখানা ও চায়ের দোকানের যাবতীয় দায় সে একাই সামাল দিত। তবে হিসাব করতে তার সব সময়ই ভুল হত। কিন্তু ভুলগুলো শ্রমিকদের অনুকূলে যেত না। ছোবড়া ছাড়ানোর মেয়ে পুরুষ শ্রমিকদের কাছে বিস্তারিত করে কালিকুট্টি এসব বলত আর জানাত যে মজুরী নগদ না নিয়ে জিনিষপত্র কিনলে শ্রমিকদেরই লাভ। সে বলত—

'মেয়েরা মজুরীর পয়সা নিয়ে হাটে বাজারে ঘুরবে—কত অপমান-জনক কথা। আমার অনুরোধ মেনে নিয়েই মালিকমশাই এ দোকানটা চালু করেছেন। কেমন সুবিধে এখন। কাজ সেরে জিনিষপত্র কেনা কাটা করে বাড়ী চলে যেতে পারবে।'

শ্রমিক গৃহিণীদের সে বলত—'চাইলেই কিন্তু মালিকমশাই মজুরী দেবেন না। কেন জানো? পয়সা পেলেই সে তাড়ি খাবে।

পুরুষদের হাত থেকে পয়সা ছোঁ মেরে নেবার জন্য কিছু মেয়ে আবার তাক্ করে আছে। পুরুষ মানুষ তাড়ি খেয়ে আর ওই সব মেয়েদের ধরে ফুর্তি করে বেড়ালে বাড়ীর লোকজনদের উপোসে কাটাতে হয়। এই কারণেই পয়সাটা নগদ দিই না।'

ছোবড়া ছাড়ানো আর দড়ি পাকানোর ব্যবসায়ের সঙ্গে চায়ের দোকান আর মুদিখানা চালিয়ে কুঞ্জু শঙ্করণ মশাইয়ের ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল। সে সময়ে তাঁর ধারণা হল যে, পাকানো দড়ির চেয়ে মাদুর পাপোষ বুনতে পারলে তাঁর বেশী লাভ হবে। কটা তাঁতের ব্যবস্থা করে মাদুর বোনাও শুরু হয়ে গেল। মুদিদোকান ও চায়ের দোকানের চেহারার পরিসরেও পরিবর্তন হ'ল।

তখন তাঁর মনে হল একটা দর্জির দোকান আর চুলছাঁটার দোকান নয় কেন? তার শ্রমিকেরা কাপড় কেনা বা সেলাইয়ের জন্য কেন অন্যত্র যাবে? কেন চুলছাঁটা আর দাড়ি কামানোর জন্য বার বার সেলুন খুঁজে বেড়াবে? মালিক বলতেন—

'আমার শ্রমিকেরা যা চাইবে সবকিছুই আমি দেব। কেবল মা-বাবা বাদ দিয়ে যা প্রয়োজন, চেয়ে নাও আমার কাছ থেকে।'

একটা গোলমেলে মজুরের কিছু চাইবার ছিল। তবে সে আর তা চাইল না।

শ্রমিকরা অবশ্য দ্বিগুণ বা বেশী দাম দিয়ে মালিকের দোকান থেকে জিনিষ নিতে গররাজী ছিল। তবে না নিলে ঝামেলা হবে, তাই ওরা ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি আপত্তি ও প্রতিবাদ চাপা থাকে না। গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। চাপা অসন্তোষ বুঝেও না বোঝার ভান করে রইলেন মালিক।

শ্রমিক অসন্তোষের গুঞ্জনকে চাপা দেবার জন্য মালিক আর কালিকুট্টি শলাপরামর্শ করে শেষে একটা উপায় স্থির করল। সে অনুযায়ী বড় মেয়ে সুমতিকে চায়ের দোকানের ম্যানেজার আর

অন্য মেয়ে নলিনীকে দর্জি দোকানের ম্যানেজার নিযুক্ত করা হবে ঠিক হল। এভাবে ছুই নতুন ম্যানেজার নিয়োগের পর কিছুদিন সব বন্ধ রইল।

আদেশ অনুযায়ী কিংবা হয়ত নিজে থেকেই সুমতি আর নলিনী শ্রমিকদের সঙ্গে হাসি মস্করাও করত। পরিণামে কিছু প্রেমাকাঙ্ক্ষীর উদয় হল আর মারপিট পর্যন্ত তা গড়াল। তবে এসব তেমন গুরুতর কিছু হয়নি।

একদিনের কথা। কিছু লোক চা খাচ্ছিল। সে সময় একগ্লাস চা নিয়ে কুঞ্জুকে দিতে গেল। চা নেবার অছিলায় কুঞ্জু সুমতির হাত ধরে একটু টানও দিয়েছে। চায়ের গ্লাসটা নীচে পড়ে ভেঙ্গে যায়। তাই সুমতি কুঞ্জুকে গালমন্দ করল আর উত্তেজনায় কুঞ্জুও দু'চার কথা শুনিয়ে দিল। এ নিয়ে যখন শ্রমিকদের মধ্যে একটা গণ্ডগোলের সূচনা হল, তখন মালিক মশাই মাঝখানে এসে পড়লেন। তিনি বললেন—

'জোর করে যদি মেয়েটার হাতটা সে ধরেও থাকে তাতেও কোন পাপ বা অনর্থ ঘটেনি। তবে আমার মতে আড়ালে ধরাটাই ভালো।'

দর্জির দোকানটাতেও প্রণয় অভিলাষ প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রেম পত্রে যে ইচ্ছার সূচনা হয়েছিল, সেখানে দর্জির ও শ্রমিকের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা, ধাক্কাধাক্কির আর মারপিটের জন্যে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা ভিন্ন চেহারা নিল। শেষ অবধি, কে জানে কি করে একটা গুজব রটল যে, এ সবই মালিক ও কালিকুট্টির ষড়যন্ত্রের ফল।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে কিছু কিছু নারকেল দড়ির কারখানায় শ্রমিকদের আন্দোলন শুরু হল। কুঞ্জু শঙ্করণ মশাই যখন জানতে পারলেন যে, রবীন্দ্রমশাইয়ের কারখানায় ঝগড়া ঝাঁটি হয়েছে, শেষটায় পুলিশ এসে এ্যান্টনী ইত্যাদি কজনকে ধরে

নিয়ে গেছে আর সেই যোগসাজসে বেলায়ুধনের মৃত্যু হয়েছে, তখন উনি রবীন্দ্রমশাইয়ের ছেলে, ছোট মালিককে অভিনন্দন জানালেন। ততদিনে ছোট মালিক মিস্ত্রীদের সাহায্যে শ্রমিকদের মধ্যে খৃষ্টান আর ইষববর্গের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজটাও শুরু করে দিয়েছিলেন।

কুট্টপ্পনের দোকানটার পাশেই সনির[১] চায়ের দোকান। রবীন্দ্রমশাইয়ের কারখানার মিস্ত্রী কেরানী ইত্যাদি লোকজন সনির দোকানেই চা খেত। কুট্টপ্পনের দোকানে গিয়ে চা খাওয়া, পত্রিকা পড়া, দুনিয়ার খবর নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি ব্যাপারকে ঐ দোকানের খদ্দেররা ঘৃণার চোখে দেখতেন। সনি নিজেও কুট্টপ্পনের দোকানের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করে থাকে। কখনও কখনও জবাবে কুট্টপ্পন কিছু বলে বসত।

বেলায়ুধনের শোকযাত্রা ইত্যাদি সম্পর্কে সনির দোকানে যেসব ব্যঙ্গোক্তি হত, তাতে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ পড়ে। এসব কথাবার্তা মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে শেষ অবধি একটা গরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। একদিন তো সনি খোলাখুলিই বলল—

'ইষবদের চোখ টাটাচ্ছে—খৃষ্টানদের পয়সা হচ্ছে দেখে। ইষবদের চোখ টাটানির ফলে খৃষ্টান মালিকের কারখানার শ্রমিকরা একটা বাহানার সৃষ্টি করে ঝগড়া বিবাদ শুরু করেছে।'

পানওয়ালা বাসু সুপারি কাটার ছুরি জাঁতি উঠিয়ে বলল—'ইষবদের বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত চলছে তা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। যদি ভাবখানা এই হয় যে, ইষবেরা কাজ করে খৃষ্টানদের পকেট বোঝাই করে দেবে তাহলে কিন্তু জেনো যে সেটা হবার নয়।'

বাসুর কথার প্রতিধ্বনি কুট্টপ্পনের দোকান, মুদিখানা আর ডাক্তারখানা অবধি ছড়িয়ে পড়ল। এরপর সনির কথা আরো কাটা কাটা হয়ে ওঠে। অন্য পক্ষেরও সেই ধরনের কথাবার্তা

১ সনি—একজন খৃষ্টানের নাম।

বেড়ে গেল। সংক্ষেপে সমস্ত আবহাওয়া এমন কলুষিত হয়ে পড়ল যে, যে কোনও সময়েই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিল।

কুঞ্জু শঙ্করণ মশাই সবাইকে যা জানাতেন তার মর্মার্থ হল—

'খৃষ্টান মালিকদের অর্থোপার্জনের জন্যে খৃষ্টান শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো প্রয়োজন। আর ইষব মালিককে যদি পয়সা কামাতে হয় তাহলে ইষব শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করতে হবে। সেটাই আসল কথা। আমিও তাই করি। আমার শ্রমিকরা সবাই ইষব। কিন্তু ইষবদের মোটেই স্বজাতি প্রীতি নেই। তার প্রমাণ হল যে, তু'পয়সা আমার হাতে এলে আমারই স্বজাতির চোখ টাটায়।'

রবীন্দ্র মশাইয়ের কারখানার সব অফিসারেরা আর দোকানদার সনি প্রচার করছে যে, খৃষ্টান শ্রমিকদের খৃষ্টান মালিকদের প্রতি মমত্ববোধ থাকা প্রয়োজন। আর ওদিকে কুঞ্জু শঙ্করণ ও কালিকুট্টি চাউর করে বেড়াচ্ছিল যে, ইষব শ্রমিকদের ইষব মালিকের প্রতি মমতা থাকা দরকার। তারা এও বলছিল যে খৃষ্টানদের ওখানে ইষবরা কাজ করতে গেলে তাদের বেশী মজুরী দাবী করা উচিত। কুঞ্জু শঙ্করণ মশাই তু'তিনটে ইষবদের সম্মিলনীতে যোগ দিলেন। বাড়ীর সামনে শ্রীনারায়ণ গুরুর ছবি টাঙালেন আর নিজের সমাজের উন্নতির জন্য তু'টাকা দানও করলেন। রবীন্দ্রমশাইয়ের বাংলোতে রোজ পাদ্রীদের যাতায়াত শুরু হ'ল।

কুট্টপ্পনের চায়ের দোকানে বসে সেই রোগা লোকটি বলল—

'শ্রমিকদের জাতি নেই, ধর্ম নেই এমনকি দেশও নেই।'

গর্জে উঠল এ্যাণ্টনীর গম্ভীর কণ্ঠ—

'খৃষ্টান হোক আর ইষবই হোক, পুঁজিপতি কিন্তু তুজনেই। আর খৃষ্টান বা ইষব যাই হোক, শ্রমিক শ্রমিকই।'

কথাটার অনুরণন উঠল। চায়ের দোকানে, চৌমাথায় আর শ্রমিকদের ঘরে।

এলীর বাড়ী এসে বুড়ো জোসেফ তাকে বলল 'তোমার আমার ছেলেরা চায়ের দোকানে বলাবলি করছিল, শ্রমিকের জাত ধর্মের কোন বালাই থাকার দরকার নেই। আর মালিক খৃষ্টান, ইষব, নায়ার যাই-ই হোক না কেন কেউই শ্রমিককে মজুরী দিতে চায় না।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক'—স্বীকার করল এলী।

'যদি জাতধর্মের বালাই না থাকে……তাহলে……?'

'না থাকলে কি?'

'আমরা না খৃষ্টান?'

'মালিকও তো খৃষ্টান। মালিকের চৌকিদারও তো খৃষ্টান। সেই খৃষ্টান চৌকিদারই না এ্যান্টনীর বাপ আর আমাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। খৃষ্টান মালিকও দোতালার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন না দৃশ্যটা? কিন্তু উনি তো টুঁ শব্দটি করেন নি।'

ঘরের ভেতরে বসে বর্কি জিজ্ঞাসা করল—

'কি, এল ওরা?'

'এসে যাবে এখুনি।'

[9]

শ্রমিকেরা সপ্তাহান্তে মজুরী পায়। তাতে ঋণশোধের সুবিধা। কিন্তু পুরো ঋণ কখনোই শোধ করতে পারে না, শোধ করবার মত মজুরী তারা পায় না। কোন শ্রমিক সবটা ধার মিটিয়ে দিতে চাইলে দোকানীরা এমন ভাব দেখাতো যেন কাজটা অনুচিত।

দোকানীদের বিবেচনায় ঋণের কিছুটা সবসময়ই থাকা ভালো,

তবেই তো আবার ধার নেবার কথাটা আসে। আবার ফিরিয়ে নেবার সময়ও জিনিষের দাম প্রচুর বাড়িয়ে লিখে নেওয়া চলে। এটাই তো ব্যবসায়ের গুঢ়তত্ত্ব। শ্রমিকেরা মুদিখানার ও বিড়ি-সিগারেটের দোকানে স্থায়ী ঋণগ্রস্ত ক্রেতা হয়ে পড়ে, পরিশ্রম করে ওরা উপার্জন করত ধারশোধ করবার জন্য।

সেদিন শনিবার—মজুরী পাওয়ার দিন, কিন্তু এ্যান্টনী আর রোক্কি মজুরী পেল না, কারণ তারা কাজ শেষ করে নি। মাত্রায়ি আর সাইমনের কিছু পাবার সম্ভাবনা ছিল। অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে এরা চারজন কারখানা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে। সব শ্রমিকদের সঙ্গেই রয়েছে ঝুড়ি টুকরী—সেদিন দোকান থেকে ধারে জিনিষ দেবার কথা। তাই সবাই ঝুড়ি থলে ইত্যাদি এনেছিল।

কিন্তু সবার চেহারার মধ্যে সেদিন যেন একটা কেমন উদ্বেগ, কিছু একটা উৎকণ্ঠার আভাষ। আগের রাতে কুট্টপ্পনের চায়ের দোকানে ভোর অবধি আলোচনা চলেছে। সেই রোগা লোকটি, পদ্মনাভন, অচ্যুতন, পপ্পন, এ্যান্টনী, রোক্কি, মাত্রায়ি, সাইমন—সবাই আলোচনায় ছিল।

সেদিন কারখানার তাঁতের শব্দের ফাঁকে ফাঁকে গুঞ্জরন আর ফিসফিসানিও শোনা যাচ্ছে।

অফিসেও সেদিন শলাপরামর্শ হচ্ছিলো। দুপুরে পুলিশ ইন্সপেক্টর অফিসের ভেতরে গিয়ে ছোট মালিকের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে। সংহারের রুদ্রমূর্তি ধরে মিস্ত্রী শ্রমিকদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কেরানী ও ক্যাশিয়ারের দলের সবার গম্ভীর ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল যেন কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

মজুরী দেবার সময় হ'ল। মিস্ত্রী বারান্দায় এসে ঘোষণা করল, 'মজুরী যারা নেবে, সবাই এসো।'

'কি ব্যাপার, মিস্ত্রী? আজ সবই যেন কেমন গম্ভীর'—জিজ্ঞাসা করল সাইমন।

'তবে কি রকম হবে? তোমরা নিজেরা যেমন তোমাদের আদর অভ্যর্থনাটাও তো সেরকমই হবে।'

কিছু বলতে চেয়েছিল সাইমন। কিন্তু গাত্রায়ি ওকে থামিয়ে দিল।

ক্যাশিয়ারের পাশে বসা কেরানীটি একজন মজুরের নাম ধরে ডাকল। মিস্ত্রী দ্বিতীয়বার হাঁকল নামটা।

'বর্কি শৌরি! হাজির?'

'হ্যাঁ'—শৌরি বুড়োর জবাব শোনা যায় পেছন থেকে।

কাঁধ থেকে ঝুড়িটা নামাতে নামাতে ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে পোঁছাল। ক্যাশিয়ার রূপোর টাকা ও কিছু নগদ পয়সা পাশে মেঝেতে রাখে। তা গুনে নিতেই শৌরির মুখখানা যেন কালো মেঘে ছেয়ে গেল।

'এটা কি হিসেব? কি রকম হিসেব?'

'আরে, নিতে হলে নিয়ে চলে যাও'—মিস্ত্রী গর্জে ওঠে।

'আমি কারুর কোন দয়া চাইছি না'—টাকা আর খুচরো মেঝেতে রেখে শৌরি বল্‌ল—'আমি আমার ন্যায্য মজুরী চাইছি।'

'এটাই মজুরী'—গম্ভীর ভাবে ক্যাশিয়ার জবাব দিল।

'তবে ত হিসেবে ভুল হয়েছে।'

'কি, আমাকে হিসেব শেখাতে এসেছো?'

'শেখাতে নয়, শিখতে এসেছি। আমার হিসাব অনুযায়ী আরও পাঁচটা টাকা আমি পাব।'

'সবাইকে টাকা দিয়ে তোর হিসাবটা দেখব'খন। এখন সরে যা।'

সরে এলো শৌরি। কেরানী আরেকটা নাম ডাকল—

'কণ্টন কোচ্চায়প্পন।'

'কণ্টন কোচ্চায়প্পন কি হাজির?' মিস্ত্রী চেঁচায়।

'হ্যাঁ,' হাতের ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে একটা প্রেতমূর্তির মত কোচ্চায়প্পন ক্যাশিয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

কোচ্চায়প্পনও বৃদ্ধ। তাকে শৌরির চাইতেও বুড়ো ও গ্রাম্য দেখাচ্ছিল। কারখানা শুরু থেকেই সে কাজ করছে। বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়ার জন্য অথবা শারীরিক ক্ষমতা কমে যাওয়া সত্ত্বেও সে কাজে ক্ষান্ত দেয়নি। কাজ না করলে তাকে সপরিবারে উপোসে থাকতে হয়। তার উপার্জনের ওপর তার বৃদ্ধা স্ত্রী বিধবা মেয়ে ও তিনটি নাতি নির্ভরশীল। বার্ধক্য বা মৃত্যুর উপান্তে পেঁ ীছেও তাকে কাজ করে যেতে হ'চ্ছে।

ক্যাশিয়ার রূপোর একটা টাকা ও কিছু পয়সা মেঝেতে রাখে। কোচ্চায়প্পন সেটা গুনে নেয়। তার হাতটা যেন সিঁটিয়ে গেল, কেঁপে উঠল সমস্ত শরীরটা। টাকা আর পয়সা সব মেঝেতে পড়ে ছড়িয়ে গেল এপাশে ওপাশে!

'ওঃ চেতলা মন্দিরের মা ভগবতী'—বলে চীৎকার করে সে বুক চাপড়াতে লাগল।

'মা ভগবতীকে নিয়ে ওপাশে যাও হে।'—মিস্ত্রী সগর্জনে বল্‌ল। সে কোচ্চায়প্পনের দিকে ধেয়ে এল। লৌহ মুঠিতে সে কোচ্চায়প্পনের গলা চেপে ধর্‌ল।

'ওকে ছোঁবে না'—একটা গুরুগম্ভীর হুঙ্কার।

চকিতে মিস্ত্রী পেছন ফেরে।

'কে রে তুই'?

'মিস্ত্রী, আমি রোক্কি'—এগিয়ে এল রোক্কি।

রোক্কিকে পেছনে রেখে এগিয়ে আসে এ্যাণ্টনী। তার গুরুগম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল।

'ক্যাশিয়ার মশাই, আমরা কাজ করলে তবেই ত মজুরীটা দেন। তবে হিসেব জিগ্যেস করলে এই চোখ রাঙ্গানো আর ঘাড়ধাক্কা কেন?' 'আমিও তো সেটাই জিগ্যেস করছি'—শৌরিও কথাটায় সায় দিল। 'জনে জনে হিসেব বুঝিয়ে টাকা দিতে বসলে অর্ধেক রাত কাবার হয়ে যাবে'—অন্যমনস্কভাবে সে বল্‌ল।

এর মধ্যে ভেতর থেকে একজন কেরানী বেরিয়ে এসে ক্যাশিয়ারের কানে কানে কিছু বল্‌ল। তাতে তার চেহারাটাই বদলে যায়। ভারিক্কিভাবে সে বল্‌ল—'তাইতো শৌরি, এদিকে সামনে এসো। তোমার হিসেবটা বলে দি।' তারপর খাতা দেখে বল্‌ল—

'এ হপ্তায় তোমার মজুরী চার টাকা বাইশ পয়সা।'

'হ্যাঁ।'

'তা থেকে 'মিস্ত্রী পয়সা' সওয়া টাকা গেছে।'

'বাবু, কি হিসাবে নেওয়া হ'ল ?'

'টাকায় চার আনা হিসাবে।'

'বাবু, এ পর্যন্ত কেবল বারো পয়সা হিসাবে চলছিল।'

'এখন বেড়ে চার আনা দাঁড়িয়েছে।'

'ওঃ, অনর্থক পয়সাগুলো জলে গেল !'

'অনর্থক জলে গেল বলছিস কেন ?' গর্জে উঠল মিস্ত্রী।

'আর কি বলব তবে ?' এ্যাণ্টনী বলল—

'আমাদের কষ্টের পয়সা যখন মিস্ত্রী ছিনিয়ে নেয়, তখন জলে গেল ছাড়া আর কি বলব ?'

'কি, তোকে জিজ্ঞাসা করেছি আমি ?'

'ছিনিয়ে নেবার কথাটা জরুরী নয় ?'

'ফের যদি বলিস্ ত .....'

'কি হবে বল্‌লে'—সামনে ছিটকে চলে এলো রোক্কি। এ্যাণ্টনা ছোট ভাইকে পিছনে হটিয়ে দিল। ক্যাশিয়ার নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—

'মিস্ত্রী, তুমি থামো তো !' শৌরিকে আবার বলল—

'মিস্ত্রীর জন্য টাকায় চার আনা হিসেব ধরা হয়েছে। সেটা বাদ দিয়ে মজুরী দেওয়া হবে। এতে রাজী না হ'লে মজুরী দেওয়া হবে না।'

'বাবু মশায়, বললাম না অনর্থক গেল। তা কেটেও তো সাড়ে তিন টাকার চেয়ে বেশী থাকছে।'

'তা থেকে আবার আট আনা কাটা হচ্ছে।'

'সেটা কেন?'

মিস্ত্রী একটা হলদে কাগজের টুকরো শৌরির দিকে এগিয়ে ধরল—

'নে, এটা ধর্।'

'কি এটা?'

'এটা? নাটকের টিকিট।'

'কি নাটক? কার নাটক?'

'চাবিট্রু[১] নাটক। যা দেখে আয় একবার।'

'আমি আগেই দেখেছি। এখন আর দেখবার দরকার নেই।'

'কি মাত্রায়ি, ওস্তাদের নাটক দেখেছিস?'

'আমার দেখার দরকার নেই।'

'দেখতে না চাস, দেখিস না। তবে টিকিটটা ত ধর্।'

'আমার চাই না।'

'সবাই যখন কিনছে তখন 'আমার চাই না' বললে তো—'

'সবাই কিনবে কে বলেছে?'—পেছন থেকে মাত্রায়ি জিজ্ঞাসা করল।

'এই, তুই চুপ কর্'—গর্জে উঠল মিস্ত্রী।

'কি, রাজী?'- গম্ভীরভাবে ক্যাশিয়ার শৌরিকে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, তবে এও 'কাটান গেল।' এর পরেও ত তিনটাকা আর কিছু পয়সা বাকী থাকে।'

'তা থেকে এক টাকা কাটা গেছে।'

'তা কেন?'

'চাঁদা।'

১। খৃষ্টানদের মধ্যে চলিত প্রাচীন ধরনের নাটক

'কিসের চাঁদা ?'

'হেড ক্লার্কের মেয়ের বিয়ের জন্য।'

'হায় ভগবান'—বুক চাপড়াতে লাগল শৌরি।

'ভগবান বলে চেঁচাস না। দিতে না চাইলে দিস না। আমি বলব যে এ দেয়নি।'

'তা নিয়ে নিন বাবু মশায়, নিন। আর যা বাঁচছে সেটা দিন।'

'শতকরা পঁচিশ ভাগ মজুরী কমে গেছে। সেটা হিসাব করে বাদ দিয়ে যা দেবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'চেত্তলা, মা ভগবতী!' কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল কোচ্চায়প্পন।

'আমরা মজুরী কমাতে দেব না'—পেছন থেকে সাইমন চীৎকার করে বলে উঠল।

'কে বলল কথাটা ?' গর্জে উঠল মিস্ত্রী।

'যারা কাজ করে তারাই বলছে'— রোক্কি বলল।

'তাহলে বাইরে চলে এসো সবাই। তালাবন্ধ হবে কারখানা।'

'মজুরী মিটিয়ে দিয়ে তালাবন্ধ কর'—জান্নু (জানকী) পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

'কে রে তুই ?' একটা হাসির আভাষ দেখা গেল মিস্ত্রীর চোখে মুখে।

সামনে এসে দাঁড়াল জান্নু। অবজ্ঞামিশ্রিতভাবে সে জিজ্ঞাসা করল—

'চেনো না জান্নুকে ? চেনো না ?···একটু তাকাও ত এদিকে।'

'তোকে,···তোকে···' জান্নুর গলার ওপরে মিস্ত্রীর হাতটা এসে পড়ল।

'ঢাই'—রোক্কির একটা সজোরে ঘুষি পড়ল মিস্ত্রীর বুকের ওপর।

মিস্ত্রীর হাতের মুঠো শিথিল হল, জান্নু মিস্ত্রীর মাথায় একটা থাপ্পড় মারে।

অফিসের ভেতর থেকে চার-পাঁচজন জোয়ান মত লোক ছুটে এল। ফটকের কাছ থেকে চা-ওয়ালা সনি চেঁচিয়ে উঠল—'হ্যাঁ, ঢুকে যাও ভেতরে, ঢুকে পড়ো তোমরা।'

বাইরের কিছু লোক এসে মিশে গেল মজুরদের ভিড়ে। মার দাঙ্গা, ঘুষি! লাথি! তর্জন-গর্জন! কান্নাকাটি হৈ চৈ-চেঁচামেচি! 'মার ঘুষি, ঘুষি মার'—জোরে চেঁচিয়ে উঠল রোক্কি।

মাত্রায়ি, সাইমন, রোক্কি, শৌরি, কোচ্চায়প্পন—সবাই ঘুষি চালাচ্ছিল। ঘুষি খাচ্ছিলও অবশ্য।

হাত বাঁধা অবস্থায় এ্যাণ্টনী একা দাঁড়িয়ে। তারও ঘুষি থেকে রেহাই নেই। অফিসঘরের ভেতরেও গর্জন আর কান্না শোনা যাচ্ছিল। টেবিল উল্টে গেল। চেয়ার সব ভেঙ্গে টুকরো হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে।

'মার, মার।' রোক্কির কণ্ঠস্বর।

'ওঃ! পুলিস আসছে,'—চীৎকার করে একজন। হাসল এ্যাণ্টনী।

* * * *

রাত অর্ধেক পেরিয়ে গেছে। বর্কির বাড়ীর বারান্দায় এলী আর আন্না শুয়ে ছিল। বারান্দার মাঝখানে শুকিয়ে যাওয়া তেলের একটা প্রদীপ যেন প্রেতাত্মার মত হাসছিল।

'কি, এল ওরা?'

জবাব মিল্‌ল না।

'ঘুঘু' 'ঘুন্নু' 'ঘুন্নুঘু'—দূরে একটা গাছের ডালে পেঁচা ডাকছিল।

'কি, এল?'—ঘুমের ঘোরে টলতে টলতে বর্কি বারান্দায় আসে।

'এল কি?'—উঠানে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটে।

'কি, এসে গেল?' গলি থেকে আবার সে প্রশ্ন শোনা গেল।

হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল এলী। পাগলিনীর মত সে জিজ্ঞাসা করল—

'কোথায়? কি, চলে গেলে?'

উঠানে লাফিয়ে নেমে এল সে।
'কি, চললে কোথায় ?' সে দৌড়াল।
'কি, এসে গেছে ?'
'কি, চলে গেলে ?'
'ঘু ঘু' 'ঘুন্ন' 'ঘুন্নু ঘু'—পেঁচা ডেকেই চলেছে।

[10]

'যেও না যেও না'—কাঁদতে কাঁদতে এলী এসে বঙ্কির পথ আটকায়।

'সরে যাও তুমি। আমার ছেলেদের দেখতে যেতে হবে'—এগিয়ে চলে বঙ্কি।

'যেও না'—এলী এসে বঙ্কির গলা জড়িয়ে ধরল। সে ব্যাকুল ভাবে অনুনয় জানায়—

'এসে যাবে ওরা। যেও না তুমি।'

বঙ্কির সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ, রাস্তায় বসে পড়ল। এলী তাকে ধরে ফেলে।

'কি, আসবে তো আমার ছেলেরা ?' আকাশের দিকে তাকিয়ে বঙ্কি জিজ্ঞাসা করল।

'আসবে, এসে যাবে ওরা।'

'যতক্ষণ না এসে পৌঁছচ্ছে···ততক্ষণ এখানটায় শুই একটু। শুয়ে পড়ে মাটিতে। এলী তার মাথাটা নিজের কোলে উঠিয়ে নেয়।

'এলী, যতক্ষণ না ওরা আসছে' সে এলীর হাতটা ধরে নিজের বুকের ওপর রাখে।

'হায়, প্রভু!'—একবার সে ছটফটিয়ে ওঠে, মুখটা হাঁ হয়ে যায়। চোখ দুটো বুঁজে গেল।

'হায়, প্রভু!' এলীর কাতরতা কান্নায় মিশে যায়। সেও উল্টে পড়ে পেছন দিকে।

'ও বাবা! মা!' চীৎকার করে আন্না ছুটে এল।

জোরে জোরে চেঁচিয়ে কাঁদে। জেগে গিয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। ভোর হওয়ার মুখে বর্কির মরদেহ আর প্রাণহীন এলীকে এনে বারান্দায় শুইয়ে দেওয়া হল। মৃত বাবার পায়ের দিকে তাকিয়ে চিবুকে হাত রেখে আন্না বসেছিল। সে কাঁদেনি। স্বপ্নাবিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করল—'কি, চলে গেল? চলে গেল কি।'

মা বাবা আর বন্ধুদের ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন আর গাঁয়ের লোকেদের তিরস্কার করে এই লোকটির সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল এলী। হাত ধরে বাধা বিপত্তি আর দুঃখসঙ্কুল পথে বহুদূর তার সঙ্গে চলেছিল। সে সব বাধা তাদের দুজনকে এক করেছে। তিক্ত কষায়ও তার কাছে স্বাদে মিষ্টি মনে হয়েছিল।

'চলে গেল? কি, ছেড়ে চলে গেল?' শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল। কেউ জবাব দিল না। তখনও গালে হাত দিয়ে আন্না বসে ছিল। জীবনে মস্ত একটা ঢেউ এসে যেন আছড়িয়ে পড়েছে, আবার আরেকটা ঢেউ উঠবে এখন।

* * * * *

এ্যান্টনী, রোক্কি, মাত্রায়ি, সাইমন আর বুড়ো কোচ্চায়প্পন ও শৌরি প্রভৃতিকে পুলিশ হাজতে নিয়ে গিয়েছে। আশপাশের লোকেরা বলাবলি করছিল যে ভোরবেলা অবধি সেখানে কান্নাকাটি আর চীৎকার শোনা গিয়েছিল।

সকাল হতে সারা আলপ্পুষা সহরের চারিদিক জুড়ে যেন তুফান উঠল। সব যেন একমুখী হয়ে সহরের দিকে ধেয়ে চলে।

'মরলাম, ভাই সব মরছি'—গলি থেকে বড় রাস্তা অবধি লোকের ভিড়। তারই মধ্য থেকে একজন সজোরে কথাটা বলে উঠল।

'তিলে তিলে মরার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়াই ভালো'—অন্য একজন সে কথার সমর্থন জানায়।

'আর মিলেমিশে থাকলে আমাদের মারবেটাই বা কে?'—তৃতীয় ব্যক্তির জিজ্ঞাসা।

'আমরা একসঙ্গে চলব, সবাই একসঙ্গে?'—আরও একজন জোরে চীৎকার করে ওঠে।

'সবাই এক। সবাই আমরা একসঙ্গে আছি'—সেই স্বরে সবাই গলা মিলাল।

সব রাস্তাতেই এ ধরনের শ্লোগান শোনা যাচ্ছে। হাজারজনের তপ্তশ্বাস উঠছিল, হাজারজনের প্রতিজ্ঞা এক হয়ে উঠে আকাশের মেঘ গর্জনের মত ধ্বনিত হচ্ছিল।

'সেই লোক! সেই রোগা লোকটি!' সেই জন প্রবাহের মধ্যে দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল। রবীন্দ্র মশাইয়ের কারখানার ফটকে দাঁড়ানো মিস্ত্রী সেই রোগা লোকটিকে দেখিয়ে ইশারায় ছোট মালিককে বলে—

'ওই ত—সেই গণ্ডগোল পাকানো লোকটা!'

কারখানার ফটক খোলাই ছিল। তবে শ্রমিকরা ভেতরে যায়নি, তাঁত চলেনি। রাস্তার ধারে, দোকানের সামনে, গাছের ছায়ার নীচে নৌকা ঘাট অথবা বাসস্ট্যাণ্ডে ছোট ছোট দলে সব শ্রমিকেরা দাঁড়িয়ে। - 'বর্কি মরে গেছে!' চাপা কণ্ঠে সবাই কথাটা বলছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। তবে ছড়িয়ে পড়ার পর তার চেহারাটা বদলে গেছে—

'বর্কিকে মারা হয়েছে।'

'কোন্ বর্কি?'

'বর্কি, এ্যাণ্টনী আর রোকির বাবা।'

'এ্যাণ্টনী আর রোক্কি তো সবারই পরিচিত। তাদের বাবাকে মেরেছে? কে?'

'কে মেরেছে এ্যাণ্টনীর বাবাকে?'

সবাই এ প্রশ্ন করল। কিন্তু জবাব কেউ দিল না।

'এ্যাণ্টনীদের বাড়ীতে সবার যাওয়া দরকার।' চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে কথাটা।

'এখনও যদি আমরা চুপ করে থাকি তাহলে আমরা প্রত্যেকেই মারা পড়ব—'। একজন শ্রমিক প্রশ্ন করল— 'চুপ না থেকে তবে করবটা কি?'

'কি করব?···করব কি? আগে ত আমরা পৌঁছাই সেখানে।'

'পৌঁছানোর পর?'

'পৌঁছানোর পর······সেটা পৌঁছানোর পর বলব।'

এ্যাণ্টনীদের বাড়ীর আশেপাশে জনসমুদ্র হয়ে গেছে। ছোট ছোট স্রোত এসে থেকে থেকে মিলছে সেই সাগরে।

'এ্যাণ্টনী আর রোক্কির বাবাকে তো মেরেই ফেলল—' সবাই ফিসফিসিয়ে বলাবলি করছে।

'কে?'

'কে?···ইঁদুর মারে কে? মুর্গী ধরে ফেলে কে?'

আন্না উঠে চারপাশে তাকাল। এর আগে কখনও সে এত লোক দেখেনি। কি রকম আক্রোশ? এত আক্রোশ কেন এদের? আন্নার যেন মনে হল তার বাবার মৃতদেহ থেকে হাজার পিশাচ জন্ম নিয়েছে।

উঠানে নেমে সে লোকের ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে থাকে। একজন শ্রমিক বলল—'এই এ্যাণ্টনী আর রোক্কির বোন।'

অন্যজন যেন আদর করে বলল—'কোথায় যাচ্ছ খুকী?'

'আমি বড়দা আর ছোড়দাকে খবর দিতে যাচ্ছি।'

শ্রোতার মুখে সহানুভূতির হাসি। একজন জিজ্ঞাসা করল—

'খুকী তুমি গেলে কি ওরা আসবে?'

'হ্যাঁ আসবে। আমি গেলে দুজনেই আসবে।'

'পুলিশ ত' ওদের ছাড়বে না বাছা।'

'ছাড়বে। আমি বললে ছেড়ে দেবে। আমি বলব যে ওরা দুজন আমার ভাই আর আমাদের বাবা মরে পড়ে রয়েছেন।'

শুনে আবার হাসল সবাই। আন্না এগিয়ে গেল।

কিছুটা দূরে ভিড়ের মধ্যে একটা সাড়া জাগল। একটা চাপা

'এসে গেছে। এরা এসে গেছে।'

'কি, এল? ছেলেরা আমার এসে গেছে?'—এলী চমকে উঠল। উঠানে নেমে সে দৌড়াল—

'কে এসে গেছে? এল কে?'

সবাই রাস্তা ছেড়ে দিল এলীকে। এ্যান্টনী আর রোক্কি এলীর হাত ধরে বাড়ীতে আসে। তাদের পেছনে সেই রোগা লোকটি। ঘরের ভেতরে ঢুকতেই লোকটি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে।

মৃতদেহের বুকটা ছুঁয়ে এলী আর আন্না কাঁদে। চোখের জল মুছল রোক্কি। এ্যান্টনী কেবল ঘুরে ফিরে সব দেখছিল।

'কি, এদের ছেড়ে দিল পুলিশ?' একজন শ্রমিক জিজ্ঞাসা করল।

'পুলিশ ত' দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের অপেক্ষায়। মৃতদেহ দেখা হয়ে গেলে আবার ওদের নিয়ে যাবে।'

পাদ্রী আসে। ক্রিয়াদি সম্পন্ন হল। শবাধারে দেহ রাখা হল।

'কি, চলে গেল? আমায় রেখে এভাবে চলে গেল?'

আবার জ্ঞান হারাল এলী।

আন্না এলীকে সামলায়।

গোরস্থানের দিকে সসম্মানের শবযাত্রা এগোয়! শবাধারের পেছনে গভীর বিষাদমগ্ন জনতার এক স্রোত ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। চৌমাথায় দাঁড়ানো এক ব্যক্তি একজন শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করে—

'কে মারা গেল ?'

'এ্যান্টনীর বাবা।'

'কে এ্যান্টনী ?'

'এ্যান্টনীকে চেনো না ?' আশ্চর্য হল শ্রমিকটি।

'কি, কারখানার মালিক ?'

'মালিকের বাবা মারা গেলে এরকম শবযাত্রা করব আমরা ?'

'তাহলে কে এই লোকটি ?'

'এ ? ও আমাদের নেতা। তারই ত বাবা মারা গেছে।' গোরস্থানের পথে শোকযাত্রাটি রবীন্দ্র মশাইয়ের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। বারান্দায় দাঁড়ানো রবীন্দ্র মশাই একবার এদিক পানে তাকালেন। তারপরই আবার ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছোট মালিক সেখানেই দাঁড়িয়ে। উঠানে দাঁড়ানো মিস্ত্রীকে দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন বললেন।

শোভাযাত্রার পেছনে সেই রোগা লোকটি একা আসছিল। তার দিকে ইঙ্গিত করে মিস্ত্রী ছোট মালিককে বলল—'এ সেই গণ্ডগোল পাকানো লোকটা!'

[11]

কে সেই লোকটি ? সেই রোগা মানুষটি ?

ভাবুকমত একটি শ্রমিক বলছিল যে, এ হ'ল গরম হাওয়ার হল্‌কা। অন্য একজন বলেছিল, না, এ চিঙ্গারী মুর্গী।

হাওয়ার মতই লুকিয়ে-চুরিয়ে অলিতে-গলিতে চলে বেড়ায়, শ্রমিকদের ঘরে ঢুকে পড়ে, চা-পানের দোকানে থমকে দাঁড়ায়।

কিন্তু এ হাওয়ায় ঠাণ্ডা আমেজ নেই, গায়ে লাগলে কারুর আর ঘুম আসে না।

এই হাওয়াতে একটা গরমভাব। নিদ্রিতকে জাগায়, জ্বলন্ত আগুন উস্কে দেয়, পড়ে যাওয়া মানুষকে উঠিয়ে দেয়, শান্তির জায়গায় অশান্তি ছড়ায়, তৃপ্তির পরিবর্তে অতৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয় সব। এ কখনো কখনো মুর্গীর মত উড়েও যায়।

এ কে? গ্রাম্য এই রোগা লোকটি?

তার গাঁ-ঘর-নাম ইত্যাদি বিষয়ে কেউই কিছু জানত না। তাকে এ বিষয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে কোন না কোন অছিলায় এড়িয়ে যায়। শেষে সবাই তাকে 'হাওয়া' বলে ডাকতো। এটা তার উপযুক্ত নামই বটে। হাওয়া—গরম হাওয়া!—তুফান জাগানো ক্ষুদে হাওয়া!

কুঞ্জু শঙ্করণের কারখানাতেও এ হাওয়া কখনো কখনো লুকিয়ে ঢুকে পড়ত।

একদিন কালিকুট্টি কুঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করল—

'কুঞ্জু, এ লোকটি কে?'

'আসে এখানে?'

'পাগলমত একটা লোক আসে না এখানে? কে লোকটা?'

'এ? আচ্ছা ওই! এখানে যে আসে?'

'হ্যাঁ, এখানে আসে আর তোমরা চুপিসারে ওর সঙ্গে কথা বল?'

'আমরা বকবকানি শুনতে যাই ওর কাছে।'

'কথাই যদি শুনতে হয় ত' বড় রাস্তায় যাও, নাকি কাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ কথা শোনে।'

'সে যদি আসে তাহলে আমরা কি করতে পারি?'

'তোমরা শোনো বলেই ত' সে বলে, তাই না?'

'সে যদি বলতে থাকে তাহলে না শুনে আমরা থাকি কি করে?'

'তোমরা কি চা খাওয়াও ওকে?'

'বেচারী মানুষ—তাই ভাবি।'

'তা বলে দিও ওকে, আর যেন সে না আসে।'

'আসেই যদি, কি হয় তাতে?'

'আসে যদি! এলে কি হয়, সেটা দেখাব 'খন।'

সেদিনও সে এল, সেই গরম হাওয়া! মেয়ে পুরুষ সব শ্রমিকেরা জুটে গেল তার চারধারে। সকলেই তাকে কিছু না কিছু বলছিল। তাকেই ত' সবার সব কিছু বলা চাই। যা কিছু শ্রমিকেরা বলল সবই সে মনোযোগ দিয়ে শুনল, তার কথাও সবাই সাগ্রহে শুনল।

সে চলে গেলে কালিকুট্টি মাধবীকে ডেকে বলে—

'মাধবী, লোকটা কে?'

'এ হল হাওয়া।'

'হাওয়া?······আমি লোকটির কথা জানতে চাইছি।'

'একে সবাই 'হাওয়া' বলে।'

'সে আসে: কেন এখানে?'

'ওই আসে এমনি।'

'তোমরা তাকে এত খাতির যত্ন কর। দেখলাম্, তুমিও ওর কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছো।'

'কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালে হয়টা কি?'

'ঘেঁষে বা সেঁটে দাঁড়াও, যত্ন আত্তি কর—এসবই বাড়ী গেলে পর। এখানে ওসব চলে না।'

'এ কোনও বদমতলবে ঘোরাফেরার লোক নয়।'

'তাহলে এভাবে কেন আসে এখানে?'

'এ?···এ···না, আমি জানি না'—তাড়াতাড়ি সে চলে যায়।

আরেকদিন এল লোকটি। লোকটি ও শ্রমিকেরা পরস্পর কথাবার্তা বলছে।

কুঞ্জু শঙ্করণের রাগ চড়ে যায়। গোপালনকে ডেকে উনি বললেন—

'আরে, এই গোলমেলে লোকটাকে কারা ডাকে এখানে?'

'হুজুর সে নিজেই আসে।'

'ও কি জাত?'

'আজ্ঞে?'

'ইষব কি? আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'জানি না, হুজুর।'

'এ ইষবদের ক্ষতি করার মত মানুষ।'

'কেন একথা বললেন হুজুর? সে কি কোন ইষবদের ক্ষতি করেছে?'

'আমার—আমারি ক্ষতি করবার জন্য সে এভাবে ঘুরছে।'

'সে এলে গেলেই কি হুজুরের ক্ষতি হবে?'

'তার আসা যাওয়ার জন্যই ত' রবীন্দ্র মশাইয়ের কারখানায় গণ্ডগোল হল। তাই—না?'

'তা রবীন্দ্র মশাই কি ইষব, হুজুর?'

'কথাটা এই যে……।'

'ব্যাপারটা কি?'

'আরে, আমি কি ইষব নই?'

'আজ্ঞে—হ্যাঁ।'

'ইষব মালিকের ভাল করা কার উচিত?'

'কার?'

'ইষব-শ্রমিকদের।'

'তাহলে ইষব শ্রমিকদের ভালটা কে করবে?'

'আরে, তোদের সবার ভালোর জন্যই তো এত সব করেছি।'

'না হুজুর চাই না। এধরনের ভালো করবার দরকার নেই।'

'হুঁ, ইষবেরা মুর্গীর মত।'

'ইষবদের মুর্গী বানিয়ে দিলেন হুজুর?'

'মারার জন্য হোক কিংবা পোষবার জন্যেই হোক মুর্গী চীৎকার করবেই। তাই না আমি বলছি যে ইষবেরা সব মুর্গী।'

'আমি বলছিলাম এ ভাবে পালা-পোষারও দরকার নেই।'

'তা ওরকম একটা অজানা লোকের কথা শুনে তোমরা মর গে যাও! হ্যাঁ, সব মর।'

'এ অবস্থার চেয়ে ত' মরাই ভালো হুজুর!'—গোপালন কথাটা বলেই জবাবের অপেক্ষা না করে চলে গেল।

'তোমরা মুর্গী সব, মুর্গী'—চেঁচিয়ে বললেন মালিক মশাই।

কুঞ্জু গোপালনকে জিজ্ঞাসা করে—

'আরে গোপলা, মালিক এত চেঁচাচ্ছিল কেন রে?'

'মালিকমশাই বলছিলেন যে, আমরা সব মুর্গী। মারার জন্য ধরো আর পালবার জন্য ধরো, চীৎকার করবেই।'

'তাহলে আর ধরা কেন? ধরতে যাবার জন্যই তো চীৎকার।'

'বলছেন যে আমাদের পোষবার জন্য ধরছেন।'

'পুষছেন তো মারবার জন্যই, ঠিক কি না?'

'মালিকের বক্তব্য হ'ল যখন ধরবার চেষ্টা হচ্ছে তখন আমাদের চীৎকার করাটা ঠিক নয়।'

'যদি মুর্গীর চেঁচানো অনুচিত হয়, তবে শেয়ালেরও তাকে ধরার চেষ্টা করাটা বন্ধ করা উচিত।'

'কুঞ্জু ভাই, তুমিও গিয়ে বলে এস কথাটা। ওই ত ওখানেই উনি দাঁড়িয়ে।'

'বলব গোপালন, পরে বলে দেব'খন।'

আবার আসা যাওয়া চলতে থাকল 'হাওয়ার'। গরম ভাব আর বেগও সে সঙ্গে বেড়ে চলেছে। ফিস-ফাস গুজগাজ ক্রমশ: দাঁতে দাঁত চাপা, চাপা হুঙ্কারে পরিণত হয়েছে। একদিন কালিকুট্টির কাছে কুঞ্জু একপয়সার বিড়ি চাইল। কালিকুট্টি দুটো বিড়ি দেয়। কুঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—

'এ কি?'

'কেন, তুমি কি বিড়ি চাওনি?'

'হ্যাঁ।'

'তা, এই ত' বিড়ি।'

'আমি একপয়সার বিড়ি চেয়েছিলাম।'

'এ একপয়সারই।'

'কি, পয়সায় কেবল দুটো বিড়ি?'

'তবে কটা চাই?'

'অন্য দোকানে পয়সায় চারটে বিড়ি।'

'সেখানেই গিয়ে কেনো।'

'শ্রমিকদের সব পয়সা এখানে রেখে দিলে অন্য জায়গায় কি করে কিনব?'

'তাহলে এখানে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে যাও।'

'খয়রাত ত' নয়!'

'তবে কি তোমার বাবার রোজগার?'

'কারুর বাপের রোজগার নয়। আমরা যা কাজ করি তারই মজুরী কামাই, সেটা দিয়ে দাও, ব্যস।'

'মজুরী তো দেওয়াই হচ্ছে।'

'নগদে দিয়ে দাও, সে কথাই বলছি।'

'পয়সা নগদ দেওয়া চলবে না।'

'আমরা দেখে নেব দেওয়া চলে কিনা।'

'বাঃ, বেশ ত দেখো।'

কুঞ্জু বিড়ি কিনল না।

আবার মাধবীরও ঝগড়া হ'ল কালিকুট্টির সঙ্গে। একদিন সে একসের চাল নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

'এর দাম কত?'

'দাম জিজ্ঞাসা করছো কেন? ঘিয়ের রুটি খাওয়াই যথেষ্ট। তাওয়া কত বড় জেনে কি হবে?'

'কাজ করি আমরা। বিনা পয়সায় রুটি খেতে আসিনি।'

'আরে কি তখন থেকে বক্-বক্ করে চলেছিস ? যেতে হয়ত' যাও, পথ দেখ।'

মাধবী চাল নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় সে বিড়বিড় করে বলে,

'কাজের জায়গাতেও খুনোখুনি। জিনিষ বেচতে গিয়েও খুনখারাপি। একেবারে মেরে ফেলে না কেন ?'

কিছুক্ষণ বাদে চাল নিয়ে ফিরে এল মাধবী। চালের ঝুড়িটা কালিকুট্টির সামনে হুট্ করে নামিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল—

'মারো, একেবারে একসঙ্গেই মেরে ফেলো।'

'তুই কাঁপছিস কেন রে ?'

'মেপে দেখো চালটা।'

'কি, বেশী হয়েছে ?'

'মাপলেই বোঝা যাবে কম কি বেশী ?'

'বল্ না তুই।'

'স্রেফ্ তিনপো রয়েছে এতে।'

'তবে একপো নিশ্চয়ই কাউকে দিয়ে দিয়েছিস্।'

'খবরদার, মিছে কথা মুখে আনবে না······দামও অনেক বেশী। তার পর ওজনেও কম। এমন করলে মাথায় তোমার বাজ পড়বে জেনে রেখো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল।

ওজনের পাল্লা দিয়ে কালিকুট্রি মাধবীর মুখে মেরে গর্জে বলল—

'দূর হ' পাজি নচ্ছার।'

মাধবী দোকানের ভেতর ঢুকে পড়েছে। লোহার দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কালিকুট্টির মাথায় সে একটা বাড়ি মারল। কালিকুট্টির মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

খবর পেয়ে কারখানা থেকে কুঞ্জু শঙ্করণ মশাই এসে পৌঁছাবার আগেই মাধবী সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়েছে।

[12]

আন্নার বয়স সতেরো পেরিয়ে গেছে, যেন ছোট একটি বিকাশোন্মুখ মুকুল। শুকনো মাটি, তপ্ত বাতাস আর আকাশভরা আঁধার—এই মুকুল হাসবে খেলবে কি করে?

আশা আকাঙ্ক্ষার জল সিঞ্চনের এই ত' সময়। এই ত' চোখে মুখে স্বপ্ন ফোটার কাল। কিন্তু আন্নার উৎকণ্ঠা কাঁটার মত বিঁধছে। চোখে তার অশ্রুকণা টলমল করে।

বাবা মারা গেছে! দু'ভাই জেলে। মা ত' পরলোকে গিয়ে বাবার সেবাশুশ্রূষা করবার জন্য ব্যাকুল।

ঘরের সব কাজ এলী করত। উঠান বারান্দা ঝাড়-পোঁছ, বাসন মাজা, উনুন জ্বালানো যাবতীয় সব কিছুই। কিন্তু যেন ষ্টোরের মধ্যে সব কিছু করে চলত সে।

কাজের ফাঁকে হঠাৎ এসে বাক্স পেঁটরা খুলত। ধোয়া কাপড় আর কালোপাড়ের দোপাট্টা পরা আন্নাকে সে বলে—

'খুকী, আমি একটু ওখান থেকে হয়ে আসি।'

'মা চললে কোথায়?'

প্রশ্নটা শুনে বিরক্ত হত এলী। কেন, আন্না কি জানে না তার বাবা কোথায়? কেন, সে কি জানে না যে মারও বাবার কাছেই থাকা দরকার? তাহলে কেন সে আবার জিজ্ঞাসা করছে 'কোথায় চললে?'

'তুই জানিস না মা কোথায় যাচ্ছে? সেখানে পৌঁছে ওর জন্য আমার কঞ্জি[১] তৈরী করতে হবে।' তাড়াতাড়ি রওনা হত এলী। আন্না থামিয়ে দিত তাকে।

১। ফ্যানভাত।

'মা, যাবে কি করে সেখানে? রাস্তা জান কি?'

'রাস্তা?—তা আমি যখন গিয়ে ওখানে পৌঁছাব, তখন ত' উনি আমার অপেক্ষায় এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কঞ্জির জন্য আমার অপেক্ষাই উনি করছেন',—আন্নাকে সরিয়ে এলী এগোবার চেষ্টা করত।

'মা, যেও না'—আন্না এলীর গলা জড়িয়ে ধরে—'মা তুমি যেতে পারবে না···প্রভুর আদেশ ছাড়া ত' কারুর সেখানে যাওয়া চলে না।' 'আমায় যেতে দেবে! যদি কেউ বলে যে বর্ক্কির বৌ দোরগোড়ায় এসে গেছে, তাহলেই আমাকে যেতে দেবে।'

'না মা, যেতে দেবে না।'

'এই, সরে যা ওদিকে!'—জোরে চেঁচিয়ে ওঠে এলী।

তবুও আন্না হাত সরাত না। 'আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমায়' বলে জোরে চেঁচাতে চেঁচাতে এলী আন্নার পিঠে মারত। আন্না কাঁদে না, রাগে না, নিঃশব্দে মার খায়। কিলচড়ে এলিয়ে পড়ে বলে, 'মা, আমিই তোমার একমাত্র মেয়ে।'

এলীর তখন হুঁস হত। মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে কাঁদতে লাগত—'আদরের ধন আমার, আমি তোকে কিলঘুষি মেরেছি!' বুক চাপড়ে কেঁদে কেঁদে বলে, 'নিজের মেয়েকেই নিজে মেরেছি। ······সেখানে পৌঁছুলেই ত তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করবেন—কেন আমার ওই মেয়েকে তুমি মারলে?'

প্রতিবেশীরা তখন ছুটে আসে। জোর করে তার হাত ধরে রাখতে হয়। কখনও কখনও আন্নাকে মারতে দেখে এগিয়ে আসত তারা আর এলীকে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করত। চেঁচিয়ে উঠত আন্না—'ছাড়িও না আমায়! মাকে ছাড়িয়ে নিও না। ইচ্ছে হলে মা আমায় মারুক, পেটাক আমাকে ধরে।'

সেই রোগা লোকটি সেখানে রোজই আসে। রোজই তাদের

ঘর-সংসারের খরচটা দিতে হয়। প্রথম দিনে যখন সে দিতে গেল তখন এলী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল—'কি, এ্যাণ্টনীর বাবা পাঠিয়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা নিজেই কেন নিয়ে এল না?'

'আর এসে দিতে পারবে না।'

'কেন, আসবে না কেন?'

'ওরা আসতে দেবে না।'

'তাহলে তাকে কে কঞ্জি বানিয়ে দেবে?'

'সেখানে কঞ্জি বানিয়ে দেবার লোক আছে।'

'তাহলে ত সে খাবে না। অন্য কেউ বানালে খাবে না।···আমি যাচ্ছি সেখানে, তাকে কঞ্জি বানিয়ে দেবার জন্য।'

রোগা লোকটি চোখ মুছতে মুছতে চলে যায় সেখান থেকে। পরের দিন যখন সে এল, আন্না দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। কাছে আসা অবধি গরম হাওয়ার দিকে সে তাকিয়ে রইল।

উঠানে এসে 'হাওয়া' তার দিকে একটা কাগজের পুঁটলি এগিয়ে দিল। সেটা নিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে সে বলল—

'এভাবে কতদিন পর্যন্ত······' কথাটা সে শেষ করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আন্না জিজ্ঞাসা করল—

'দিনের পর দিন এনে দিচ্ছেন এভাবে······তবে কোত্থেকে?'

'শ্রমিকেরা চাঁদা তুলে ব্যবস্থা করেছে।'

'তবে ত······' কিছু সে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলল না।

'চলি আমি?'—বিদায় চাইল লোকটি।

'আচ্ছা, তবে······' সেও কথাটা শেষ করল না।

'কাল 'আবার' এসময়ে আমি আসব এখানে।'

'আমার বড়দা, ছোড়দা কবে আসবে?'

'এসে যাবে। বেশী দেরী হবে না।'—সে আর দাঁড়াল না

সেখানে। গলিতে নেমে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। আন্নার প্রশ্নকে তার ভয়।

কেটে গেল আরও কিছুদিন। একদিন পয়সা নিয়ে যখন সে এল, তখন এলী বারান্দায় দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে বসে—

'তুমি রোজ এভাবে এখানে আসো কেন? আমি জানতে চাই—কেন?'

সে চুপ করে রইল। এলীর গলা উঁচু পর্দায় চড়ল—

'এ মেয়েই ত আমার একমাত্র সম্বল। একে ভজাবার তালে তুমি রোজ আসো এখানে। তাই না?'

মাথা হেঁট হয়ে এলো তার। ঘাবড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল আন্না। করুণস্বরে সে মিনতি করে বলল—

'মা, তুমি কার সঙ্গে এভাবে কথা বলছো?'

'কার সঙ্গে? যাদের মারার ব্যবস্থা হয়েছে এ তাদের চালায়। ওহে, আর এসো না এখানে। আর যদি আসো ত……' বারান্দা থেকে ঝাড়ু তুলে নিয়ে এলী উঠানে লাফিয়ে নেমে এল।

আন্না এলীকে ধরে থামাল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—'মামণি আমার, এমন কথা বলো না……যিনি এসেছেন তিনি আমাদের—'

'ফুঃ! সর্ এখান থেকে।' এক ধাক্কা। আন্না চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি এসে লোকটি আন্নাকে উঠতে সাহায্য করে। আন্না অনুনয় করে বলে—'ক্ষমা করবেন। যা মা বলেছেন সেসব মনে রাখবেন না। এখন মা অসুস্থ কিনা!'

একটু হাসল সে—করুণ হাসি।

'তুই আমার মেয়েটাকে মারতে আসিস, তাই না?'

এলী তার দিকে ঝাড় তুলল।

'ওঃ, মা!'—জোরে চীৎকার করে উঠে আন্না ধরে ফেলল

ঝাড়ুটা। এলী ঝাড়ু ছেড়ে দিল। মুষ্টিবদ্ধ হাতে সে তখন আন্নার বুকে পেটে ঘুষি চালাতে লাগল। রোগা লোকটির চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। এলীর দুটো হাতই সে সজোরে ধরে। এলী ধাক্কা মারল। লোকটি আরও জোরে চেপে ধরল। তার হাতের চাপে এলীর হাত যেন পিষে গেল।

এলী জোরে চেঁচিয়ে উঠল—

'উঃ, আমায় মারছে। ওঃ, আমায় মারছে।'

'একটা দড়ি নিয়ে এসো' আন্নাকে ডেকে বলল লোকটি।

শিউরে উঠল আন্না। তার চোখে মুখে রাগ ফুটে ওঠে। সে জিজ্ঞাসা করল—

'দড়ি কেন?'

'হাত বাঁধার জন্য।'

'ছাড়—আমার মাকে ছেড়ে দাও। আমার মা আমাকে কিল ঘুষি মারুক, আমায় মেরেই ফেলুক, তাতে কি হ'ল……ছেড়ে দাও, ছাড় আমার মাকে'—গর্জে উঠল আন্না।

হাত আলগা করে দিল রোগা লোকটি।

প্রতিবেশীরা দৌড়ে এল। এলী তাদের চেঁচিয়ে বলল—

'এই, এ-ই মারতে এসেছিল আমায়! আমার মেয়েটাকেও নিয়ে গিয়ে মারতে চায়।'

একটি লোক কাগজের একটা ছোট পুঁটলি আন্নার সামনে রেখে চলে গেল। গলিতে পৌঁছে চোখ মোছে সে।

আন্না কাগজের পুঁটলিটা তুলে ভালো করে দেখে। পুঁটলিটা নেতিয়ে গিয়েছিল।

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল গরম হাওয়া। গরমের দাপট সরবে বেড়ে চলল। ক্রমে হাওয়া এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়।

'তুনিয়ার মজতুর এক হও—'! এ ধরনের একটা রব উঠল। শ্রমিক বস্তীতে, চায়ের দোকানে আর চৌমাথায় তা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আলপ্পুষার শ্রমিক কেবল আলপ্পুষা, তিরুবিতাঙ্কুর বা ভারতেই রইল না। সমস্ত বিশ্বের শ্রমিক হয়ে উঠল। তোমার হারাবার কিছু নেই কেবল জেঁকে বসা শেকলটা ছাড়া। অন্যদিকে তোমার পাওনা সারা পৃথিবীটাই। হারাবে কেবল দাসত্বের শৃঙ্খল, সঙ্গে বিলুপ্ত হবে—দারিদ্র্য, উপবাস, রোগ আর পীড়ন। পাবে এক নতুন জগৎ।

আলপ্পুষার এক একটি শ্রমিক নিজের নিজের কল্পনায় জগৎ গড়েছিল। তাতে এক আধটা নয়, হয়ত সমগ্র বিশ্বের ছবি দেখেছিল—তাতে ভারত তিরুবিতাঙ্কুর আর আলপ্পুষাকে চিনতে পেরেছিল। কাগজের ছোট নক্সাতেই বিশ্বের কল্পনা করে নিয়েছিল।

তবে এখন সবারই জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আলপ্পুষা, তিরুবিতাঙ্কুর আর ভারতের বাইরেও তুনিয়া ছড়ানো। সেখানেও শ্রমিক রয়েছে। তারা সব একশ্রেণী। এবং তাদের সংগঠিত হতে হবে। তারা এও চিন্তা করল যে, তাদের দারিদ্র্য স্থায়ী নয়। সেটা দূর হওয়া সম্ভব এবং হওয়া প্রয়োজন। এখন সুসংবদ্ধ হতে পারলে সারা তুনিয়াই তাদের নিজেদের হয়ে যাবে।

সেই রোগা লোকটিকেও নিয়মিত কোন না কোন জায়গায় দেখা যেত।

প্রতিদিনের মত সেদিন সকালেও গ্রামের স্বচ্ছ চঞ্চল ঝরনার মত গ্রামের শক্তি কারখানার দিকে বয়ে যায়। সন্ধ্যায় আবার সেই স্বচ্ছ ধারা কলের গরম আর নোংরা জলের চেহারা নিয়ে গাঁয়ের দিকে আসে।

এই শক্তির মধ্যে মনুষ্যত্বের ছায়া নেই, যেন কোনোদিন তা মনুষ্যত্বকে চেনে না, জানে না।

কিন্তু সেই শক্তিপ্রবাহে সূর্যরশ্মি পড়েছে—তা স্বাধীনতা সূর্যের আলো। সেই স্রোতের গভীর থেকে মনুষ্যত্বের ফেনা উথলে উঠছে। যেসব লোকেরা নীরবে মাথা নুইয়ে চলত, তারাও রাগে কাঁপতে শুরু করল। কখনও কখনও তাদের মধ্যে হুঙ্কার, সরব আলোচনা, শপথ শোনা যাচ্ছে।

'পুঁজিবাদ নিপাত যাক্'—শ্লোগান দেওয়ার সময় মনে হত যেন হৃৎপিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে আসছে।

পদ্মনাভন, অচ্যুতন, জোসেফ, শঙ্কু—এরা সব ছিল এই জাগরণের প্রতিনিধি। কারখানার কাজের পর সবাই এরা প্রচারক হয়ে যেত। চৌমাথায় আর চায়ের দোকানে এরা দীর্ঘ ভাষণ দেয়, আলোচনা করে। এরা নিজেদের মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনুভব করে। অন্যদেরও স্পন্দিত করে।

গোড়ায় যে শ্রমিক সংগঠন তৈরী হয়েছিল তার অফিসঘরে বসে পদ্মনাভন বলে—

'আমরা সবাই এক হয়ে যদি সমস্বরে আওয়াজ তুলি……'

'হুঙ্কার করলে কি হবে?' শঙ্কু জিজ্ঞাসা করল।

'সে হুঙ্কারে সব থর থর কাঁপবে। সারা দুনিয়া কেঁপে উঠবে। হ্যাঁ, সারা দুনিয়া কাঁপবে এখন……'

কথাটায় সমর্থন জানিয়ে জোসেফ বলল—'পুঁজিপতি কেঁপে উঠবে, কাঁপবে পুলিশ, সবাই কাঁপবে। বুঝলে?'

'তাহলে কেন আমরা গর্জে উঠছি না?' পপ্পন জিজ্ঞাসা করল।

'দেখো আমাদের হুঙ্কার, সবাই মিলে আওয়াজ ওঠাব আমরা। দেখিয়ে দেবো তখন।'

নিরাশ হয়ে অচ্যুতন বলল—

'আওয়াজ তুলেছিল যারা, আজ তারা জেলের ভিতরে ছটফট করছে।'

'ওরা জেলে ছটফট করছে বলেই তো আমরা এখানে এক হয়ে যাচ্ছি সবাই। বুঝছো না?'

'এক হয়ে গেছি কি আমরা?'

'কেন?......এই সংগঠন আর অফিস তাহলে কি?'

রোগা লোকটি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—'শ্রমিকেরা এক হবে। একত্রে আওয়াজ তুলবে। কেঁপে উঠবে সারা ছুনিয়া। শ্রমিকেরাই ছুনিয়া শাসন করছে।' উঠে দাঁড়িয়ে আবার সে বলল—'একটা দেশে শ্রমিকেরা সব এক হয়েছে। একত্রে ধ্বনি তুলেছে তারা। সেখানকার পুঁজিপতি আর শাসকেরা কেঁপে উঠেছে। কেঁপে ভেঙ্গে পড়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

'কোন্ দেশের ব্যাপার এটা?' পদ্মনাভন জিজ্ঞাসা করল।

'রুশ দেশে।'

'রুশ? কোথায় সেটা?'—জোসেফ জানতে চাইল।

রোগা লোকটি রুশিয়া এবং সেখানকার বিপ্লবের কথা সব বলল। খুব মনোযোগ দিয়ে সবাই শুনছিল। শেষে পদ্মনাভন জিজ্ঞাসা করল—'তাহলে তো।'

'তাহলে কি?'—জোসেফের প্রশ্ন।

'আমরাও এখানে......'

রোগা লোকটি মাঝখানে বলল—

'আমরাও এখানে একটি বিপ্লব আনতে পারি। সেটা ভীষণ প্রয়োজন। পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার যাবতীয় দমন শোষণ নীতি কেবলমাত্র বিপ্লবের দ্বারাই নির্মূল করা সম্ভব।'

'বিপ্লব। তার মানে কি ?'

'রুশদেশে শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করেছে, মেরেছে বহু লোক। বহু শ্রমিকও মারা গেছে। রাস্তায় রাস্তায় রক্তের নদী বয়ে গেছে। ওটাই বিপ্লব।'

'তারপরে ?'

'শাসন ব্যবস্থা শ্রমিকেরা নিজেরাই দখল করে নিয়েছে।'

'তাই সেটা তাদের জন্য বিপ্লব।'

'কিন্তু এখানে ?'

'এখানেও বিপ্লবের প্রয়োজন আছে। এখানেও রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া দরকার। শাসনযন্ত্র এখানেও কেড়ে নিতে হবে।'

'কেবল পুলিশ নই, তখন অনেক কিছু—সব কিছুই হব আমরা' —দৃঢ়স্বর সেই রোগা লোকটির।

সব, সবই হবে শ্রমিকের, সমস্ত সম্পত্তিরই অধিকারী হবে শ্রমিক।

মাথা ওঠাল, বুক চিতিয়ে দাঁড়াল সবাই।

কুট্টপ্পনের দোকানে অর্ধেক রাত অবধি তর্ক-আলোচনা চলল। গরম হাওয়া সজোরে বইতে শুরু করেছে।

মাঝরাতে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে গেল সবাই। কুট্টপ্পন আর রোগা লোকটি সেখানেই থেকে গেল রাতে।

বাইরের দরজায় হঠাৎ খটখট শব্দ। দুজনেই জেগে ওঠে। দরজায় শব্দ করতে করতে কোন এক নারী কণ্ঠ বলে উঠল—

'এই! এই!'

'কে ?' কুট্টপ্পন উঠল। রোগা লোকটিও উঠে পড়ল।

দরজার একটা কপাট খুলে উৎকণ্ঠিত কুট্টপ্পন জিজ্ঞাসা করল— 'কে ওখানে ?'

গলির আলো নিভে গিয়েছে। অন্ধকারে ছায়ার মত কেউ

একজন। মাঝে মাঝে ফোঁপানি, কান্নার শব্দ। কুট্টপ্পন আবার প্রশ্ন করল—

'কে? বল কে ওখানে?'

'কি, হাওয়া রয়েছে এখানে? হাওয়া?'—ফোঁপাতে ফোঁপাতেই প্রশ্নটা এল।

'হ্যাঁ, এখানেই। কি চাই?'—রোগা লোকটি এগিয়ে আসে।

'মা!'……ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটি।

'কে? আন্না? কি হল মায়ের?'

'নিখোঁজ হয়ে গেছে মা। এদিকে এসেছিল কি? তোমরা দেখেছো?' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছিল।

'কবে থেকে খুঁজে পাচ্ছো না মাকে?'

'সন্ধ্যার পরে বাবাকে কঞ্জি তৈরী করে দিতে হবে বলে মা গলির দিকে ছুট লাগিয়েছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলি। আমায় খুব মারল। তবুও খুব অনুনয় বিনয় করে তাকে ফিরিয়ে আনি। কঞ্জিও খাওয়ালাম। তারপরে শুয়ে পড়ি আমরা দুজন। মাঝরাতে উঠে দেখি…'গলা দিয়ে ওর আর শব্দ বেরোচ্ছিল না।

'চলে এসো আমার সঙ্গে'—এগিয়ে গেল রোগা লোকটি। আন্নাও চলল তার পেছনে।

দুজনে নির্জন ঘন অন্ধকার রাস্তায় হাঁটছে। রাস্তার দুপাশে খুব ভাল করে নজর রেখে চলছিল। আন্না জিজ্ঞাসা করে—

'আপনি রাস্তা সব জানেন ত?'

'কোথাকার রাস্তা?'

'স্বর্গের দিকে যাবার পথটা?'

সে জবাব দিল না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল।

আবার প্রশ্ন করল আন্না—

'কিভাবে যাবেন?'

উত্তর মিলল না।

'আগে সেখানে গেছেন কখনো ?'

'না।'

'সেখানে গেলে কি আর ফিরতে পারে না ?'

'না।'

'তাহলে আমার মা'···সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

রোগা লোকটি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। আন্নার কাঁধের উপর সে হাত রাখল। নিজের কাছে টেনে নিল তাকে।

'কাঁদতে নেই। হয়তো মা সেখানে যায়ইনি এখনও—' বলে সে আন্নার চোখের জলটুকু মুছিয়ে দিল।

আর কিছু সে বলল না। আর বলবেই বা কি ? আন্না বিশ্বাস করে বসেছিল যে দূর স্বর্গে মা গেছে বাবার জন্য কঞ্জি তৈরী করতে আর সেখানে যাওয়ার পর ফিরে আসা মার পক্ষে অসম্ভব হবে। কি আর বলার আছে একে ?

কিন্তু একটা সন্দেহ উঁকি দিল রোগা লোকটির মনে। পাগলাটে মেয়েমানুষটি রাস্তায় কোথাও পড়ে মরে যায়নি তো ? কে জানে ?

ওরা চলতে থাকে। কিন্তু জানে না কোথায় চলেছে।

ভোর হল। শহরের পূর্বসীমায় যেখানে নালাগুলো সব মিলেছে সেখানে রাস্তা শেষ। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝিল আর নারকেল বাগানের ওপাশে সূর্যোদয় দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে পড়ল রোগা লোকটি। পাশের নারকেল গাছে হেলান দিয়ে আন্নাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। 'হায় আমার মা মণি !' মূর্ছিত হয়ে পড়ল আন্না।

সেই লোকটি তাকে সাবধানে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলো। আশে পাশের সব লোকজন দৌড়ে এল। একটা খাটিয়ায় শুইয়ে আন্নাকে বাড়ীতে আনা হল।

পরের দিন শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে বৈবনাট্ট ঝিলের জলে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখা গেছে।

[14]

একা পড়ে গেল আন্না। বাবা মারা গেলেন; তাকে কষ্টি তৈরী করে দিতে মাও গেল স্বর্গে। বড়দা আর ছোড়দা জেলে। এখন তার জীবনের বসন্তকাল যেন জ্বলন্ত মরুভূমি।

সেই রোগা লোকটি রোজই আসে। কাগজের পুঁটলি একটা আন্নার হাতে দেয়, রোজকার খরচ চালাবার জন্য সেটা যথেষ্ট।

লোকটি তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না। এদের দুজনের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তর সবই যেন জানা ছিল। আলাদা করে জানতে চাওয়ার প্রয়োজনটাই বা কি ?

কাগজের পুঁটলি দেবার পর দুজনে কিছুক্ষণ একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাসে একটু দুজনেই। তারপর লোকটি চলে যায়। তার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে আন্না। গলির মুখে পৌঁছে লোকটি একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখত। তখনও আন্না তাকিয়ে আছে লোকটির চলার পথের দিকে।

একদিন কাগজের মোড়কটা দেবার পর লোকটি যেন কিছু একটা বলতে চাইল। কিন্তু গলা দিয়ে তার শব্দ বেরোচ্ছিল না। আবার আরেকদিন মোড়ক হাতে নিয়ে আন্নাও যেন কিছু জানতে চাইছিল। কিন্তু তারও গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না।

অন্য একদিনের কথা। কাগজের মোড়কটা নিয়ে ব্যাকুলভাবে আন্না দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল—

'কি ব্যাপার ? কথা আছে কিছু ?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে আন্না বলল—

'এভাবে আর কতদিন ····· ?'

'কি, আমার পয়সা নিতে অসুবিধা হচ্ছে কিছু ?'

'নিতে ত অসুবিধা নেই।'

'তাহলে অসুবিধাটা কোথায় ?'

'এভাবে দিনের পর দিন এনে পয়সা জোগানো···'

সে হাসল একটু। আন্না জিজ্ঞাসা করল—

'এভাবে কি রোজ পয়সা আনা সম্ভব ?'

'যতদিন না ফিরছে তারা দুজন, ততদিন ত দরকার।'

'আসবে কি তারা ?'

'আসবে।'

'তবে যে বলে স্বর্গে গেলে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়।'

'আমি এ্যান্টনী আর রোক্কির কথা বলছি।'

'তারা কবে আসবে ?'

'আর কিছুদিন বাদেই।'

'ওরা আসবার পরও আপনি আসবেন তো এখানে ?'

মাথা নীচু করে ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়াল। আন্না কিছু প্রশ্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি আর করল না।

ঘুরে আস্তে আস্তে হাঁটতে আরম্ভ করে লোকটি। গলির মুখে পৌঁছে সে ফিরে তাকায়। তখনও সে তাকাচ্ছিল আন্নার দিকে।

মাত্রায়ি আর সাইমনের বাবা জোসেফ বলছিল আন্নাকে রাত্রে তাদের ঘরে শোবার জন্য। কিন্তু আন্না রাজী হয়নি। যেখানে তার মা থাকত, বাবার যেখানে মৃত্যু হয়েছে, সে ঘর ছেড়ে আর কারো ঘরে রাত্রিবাস তার ভালো মনে হয়নি। সে বলে—

'আমি যাব না, দাদাজী। আমার মা বাবার কাছে যতদিন না যাচ্ছি, ততদিন এখানেই শোব আমি।'

বাবার খাটের পাশে, মায়ের মাদুরেই সে শুত। স্বপ্নে সে মা বাবার দেখা পেত, তাদের সঙ্গে কথা বলত।

একদিন রবীন্দ্র মশাইয়ের কারখানার মিস্ত্রী আন্নার ঘরে আসে। আন্নাকে জিজ্ঞাসা করে—

'তোমার থাকা শোয়া চলছে কি ভাবে ?'

সে কোনও কথা বলল না।

'কারখানার দিকে আসিস না কেন তুই ?'

সে চুপ করে রইল।

'কোনও কথা বলছিস না কেন ?'

'কি আর বলব ?'

'জানতে চাইছি, কি কারখানায় ঢুকতে চাস ?'

'কেন ?'

'কেন ?……এলে কাজ দিয়ে দেব।'

'আমার বড়দা আর ছোড়দা ছাড়া আমি যাব না।'

'কবে নাগাদ আসবে ওরা ?'

'হুঁ।'

'তাহলে খরচ পত্তরের কি হবে ?'

'কোন না কোনভাবে চলে যাবে।'

'তা, একটা কথা শোন্।'

'কি ?'

'তোর কাজ করতে আসার দরকার নেই, তবে মজুরীটা দিয়ে দেব'খন।'

'তা কেমন করে হয় মিস্ত্রী ? কাজ না করে মজুরী মেলে কিভাবে ?'

'সেটা ?……ও……ত………' —এমনভাবে সে হাসল যেন কথাটা আন্না জানে।

চট্ করে আন্না চলে গেল সেখান থেকে।

জোসেফকে কথাটা বলেনি আন্না। কিন্তু পরের দিন যখন রোগা লোকটি এল, তখন সে তাকে বলল—

'কারখানার মিস্ত্রী এসেছিল এখানে।'

'কেন ?' —ভুরু কোঁচকাল লোকটি।

'আমায় কারখানায় যেতে বলল। আমি বলে দিয়েছি যে যাব না। তখন আরও বলেছে যে, আমার না গেলেও চলবে, যাওয়ার দরকার নেই। এখানেই মজুরী পেয়ে যাব। আমি যখন জিগ্যেস করলাম যে বিনা কাজে মজুরী কেমন করে দেবে ? তখন সে হাসতে লাগল।'

'হুঁ'—একটা তীব্র হুঙ্কার যেন গর্জে উঠল।

সেদিন বিকেলে মিস্ত্রী এল। সে জিজ্ঞাসা করল—

'রাতে সঙ্গে কে থাকে ?'

'জোসেফ দাদা এসে শোবে এখানে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিস্ত্রী আবার বলল—

'আমি ছোট মালিকমশাইয়ের আদেশ মত এখানে এসেছি।'

আন্না কিছু বলল না।

'ছোট মালিকমশাই বলছিলেন তিনি রাত্রে আসবেন।'

'কেন ?'

'আমায় বলেছেন তোকে যেন জানিয়ে রাখি।'

'নিজের জমি বাড়ীতে তিনি আসতে চাইলে আমায় আগে বলা কিংবা জিগ্যেস করার কি দরকার ?'

'জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ? ……উদ্দেশ্যটা এই……'সে হাসতে শুরু করল।

আন্না চলে যায় সেখান থেকে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। জোসেফ বুড়ো এল। মাদুর বিছিয়ে বারান্দায় সে শুয়ে পড়ে। কাশতে কাশতে গোঙাতে গোঙাতে তার ঘুমও এসে গেল। আন্না ঘুমায়নি।

আচম্বিতে গাছের ওপাশে আওয়াজ। যেন মনে হল উঠানে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে কেউ। আন্না নীচু গলায় ডাকল 'দাদাজী !'

জোসেফ জাগল না। তবে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল।

'আর যদি আসে তবে—' নিজেকেই প্রশ্ন করল আন্না। সে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হেঁসোটা হাতে নিয়ে মাথার কাছে রেখে আবার শুয়ে পড়ে।

কোনও লোকের দৌড়ানোর আওয়াজ। সে সঙ্গে একটা গর্জন আর চীৎকার শোনা গেল।

হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়াল আন্না। হেঁসোটা হাতে চেপে ধরে সে দরজাটা খোলে। আবার একটা চীৎকার।

আন্না চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

'কে ওখানে ?'

'হায় রে! কি হল, এ কি হয়ে গেল ?'—জেগে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল জোসেফ।

আন্না উঠানে নেমে এল। জোসেফও এল। ঘাবড়ে গিয়ে জোসেফ জিজ্ঞাসা করল—

'কি রে মেয়ে ? কি ব্যাপার ?'

গলির দিক থেকে চার পাঁচজন উঠানে উঠে এল। রোগা লোকটি আন্নার পাশে এসে বলল—

'না, কিছু না।'

'কে চেঁচিয়েছিল ?'

'ও এমনিই চেঁচিয়েছে।'

'এমনিই কেউ চেঁচায় নাকি ?'

'আরে ও খেলোয়াড়, সামান্য খেলোয়াড়'—সে আন্নার আরো কাছে এগিয়ে এল—

'এটা কেন ? এই হেঁসো ?'

'এটা ?······এটা'—সে দাঁতে দাঁত চাপল।

'আর গোলমাল কিছু হবে না। গিয়ে শুয়ে পড়'—লোকটি উঠে চলে গেল। অন্যেরাও তার পেছনে চলল।

জোসেফ আন্নাকে জিজ্ঞাসা করে—

'হ্যাঁরে মেয়ে, কে চেঁচিয়েছিল?'

'মনে হয় ছোট মালিকমশাই।'

কিছুক্ষণ থেমে সে বলল—

'যদি ছোট মালিক হন, তবে……!'

'তবে কি?'

'সাপকে পিটিয়ে ছেড়ে দিলে……।'

'পিটিয়ে ছেড়ে দিলে কি?'

'সুযোগ পেলেই সে শোধ নেবে। তবে ও জাত সাপ—মারলে, ব্যথা দিলে পাল্টা নেবেই।

……তাই না?'

'হ্যাঁ, একেবারে ঘায়েল করলেও বিপদ। মেরে ছেড়ে দিলেও বিপদ।'

'তা, কি করা যাবে?'

'হায়, প্রভু!'—জোসেফ আকাশের দিকে তাকাল।

দুদিন পেরিয়ে গেল। ভোরবেলায় রান্নার জন্য উনুন জ্বালছিল আন্না। বাইরে কে যেন ডাকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। উঠানে পাঁচ ছ'জন লোক দাঁড়িয়ে। পদ্মনাভন, অচ্যুতন, জোসেফ ও শঙ্কুকে সে জানত। দু'তিনবার এ্যান্টনী ও রোকির সঙ্গে এরা এসেছে। অন্য দুজনকে সে চিনতে পারেনি।

সবার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল—ছোট চকচকে চোখ, গোলগাল চেহারার মধ্যমবর্ণ ও বেঁটে একটি লোক। অন্য সবাই যেন একেই সসম্ভ্রমে এগিয়ে দিয়ে পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বেঁটে-খাটো লোকটির পরনে একটা ময়লা কাপড় ও পাঞ্জাবী। তবে তার দামী ঘড়ি ও পকেটে দামী কলম দেখা যাচ্ছে। অন্যমনস্ক-ভাবে ধরা চামড়ার একটা সুন্দর ব্যাগও ছিল হাতে।

আন্নাকে দেখে গম্ভীরভাবে একটু হাসল লোকটি। পদ্মনাভন বিনয়ের সঙ্গে তার পরিচয় দিল—

'—এ-ই এ্যান্টনীর বোন!'

গম্ভীর হাসির রেখা টেনে সেই ছোটখাটো লোকটি আন্নাকে জিজ্ঞাসা করে—

'আমায় চেনো?'

'উনি আমাদের……'পদ্মনাভন পরিচয় দেবার জন্য ব্যস্ত হলে সেই লোকটি বাধা দিয়ে আবার আন্নাকে বলে—

'এ্যান্টনী, রোক্কি—সবাই পরশু আসবে। আমি সেই খবরটাই দিতে এসেছি।'

'আসবে?……কবে আসছে?' আন্নার মন আনন্দে মেতে উঠল। 'পরশু আসবে। কারামুক্তদের যথোচিত স্বাগত জানাবার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। আন্নারও আসা চাই।'

'কোথায় আসতে হবে?'

'খবর পাঠাব।……এমনিতে ত ভালোই আছ?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছি।'

'তাহলে চলি এখন?'

'আচ্ছা।'

চলে যায় লোকটি। অন্যেরা পেছনে পেছনে চলল। কেবল জোসেফ রইল, সে আন্নাকে জিজ্ঞাসা করে—

'কে উনি? জান কি?'

'কে?'

'আমাদের নেতা। ভগবানের মতই বড়। অনেক লেখাপড়া জানা আর পয়সাকড়িও প্রচুর। গরীবের উদ্ধারের জন্যই সবার মাঝে এসে হাজির হয়েছেন।' একনিঃশ্বাসে সবগুলো কথা জোসেফ বলে গেল।

'পরে যদি আসেন ত, তাঁকে ভগবানের মতই অভ্যর্থনা জানাব—

খুব তাড়াতাড়ি উনি চ'লে গেলেন এখান থেকে।'

'আসছে? আমার বড়দা আর ছোড়দা!'—আনন্দে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

[15]

কমরেড নীলকণ্ঠন—এই তাঁর নাম। তিনি উচ্চ বংশজাত শিক্ষিত এবং উপাধিধারীও বটে।

রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির নানা বিভাগে যেমন তাঁর জ্ঞান, তেমনি ইতিহাস ও তত্ত্বশাস্ত্রেও তিনি পণ্ডিত। আদর্শনিষ্ঠা, স্বাধীনতাবোধ এবং উন্নতদৃষ্টিই তাঁকে আন্দোলনের পথে টেনে এনেছে। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন আর সরকারী চাকুরী পাওয়ার সব চেষ্টা এড়িয়ে নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মাঝে নেমে এসেছেন। তিনি শপথ নিয়েছেন যে কেবল রাজনৈতিক পরাধীনতাই নয়, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরবশ্যতার উৎখাতও করবেন।

উচ্চকুলে জমিদার বংশে তাঁর জন্ম, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এদের বিশেষ স্থান ছিল। বিদেশী শাসনের নিপীড়ন এঁকেও সহ্য করতে হয়েছে। এসব সত্ত্বেও এই যুবক পরাধীনতা মোচনের ক্লেশ সহ্য করে, অবলীলায় অনেক কিছু করার শক্তি নিয়ে এবং দুর্গতের চোখের জল মোছাবার জন্যই যেন উর্ধ্বলোক থেকে জনতার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। তাই জনগণও তাঁকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত।

পীতাভ, বেঁটে গোলগাল চেহারার মানুষ তিনি। তাঁর চোখদুটো যেন বাঘের মত। বোতামহীন নোংরা জামা আর একটা

ধুতি পরনে। কিন্তু সবসময়ই দামী কলম আর ঘড়ি তাঁর সঙ্গে থাকত। জুতো পায়ে, হাতে চামড়ার ব্যাগ, দূরে দৃষ্টি রেখে তিনি ঘুরে বেড়াতেন।

কমরেড নীলকণ্ঠন! কষ্টসহিষ্ণুতা এবং অনায়াসে সব কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন বলে সকলের প্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তাদের রক্ষক ও মন্ত্রের উদ্‌গাতা হয়ে উঠলেন। পারিপাট্যের অপেক্ষা না রেখে, দাঁতমুখ ঝকঝকে রাখার পরোয়া না করে, বিনা বেশবিন্যাসে জনসাধারণের মাঝে জলকাদায় ত্বরিৎগতিতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। তার কোনও ভুলত্রুটিকে মনে হত যেন সেটা জলের উপর তেল ভাসছে।

কমরেড নীলকণ্ঠনের কাছ থেকে পরামর্শ এল যে কারামুক্তির পর এ্যান্টনী, রোক্কি, সাইমন, মাত্রায়ি, কোচ্চায়প্পন ও শৌরীকে পূর্ণসম্মানে স্বাগত জানাতে হবে। এক গোপন সভায় তিনি বললেন যে বিপ্লবের জন্য আত্মত্যাগ প্রয়োজন। পদ্মনাভন, অচ্যুতন আর জোসেফ সে সভায় অংশ গ্রহণ করেছিল। তিনি সেদিন বলেন এই আত্মত্যাগের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে শিখলেই তবে শহীদ হবার বাসনা আরও বেশী জাগবে সকলের মনে। একথাও তিনি বলেছিলেন যে, এ্যান্টনীর মত লোকেরা শ্রমিকের প্রয়োজনীয় দাবী নিয়েই আন্দোলন করেছে, তাই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা জানানোর অর্থ শ্রমিক-দুনিয়ার সব দাবীর প্রতিই সমর্থন জানানো। এই আভাষও তিনি দিয়েছিলেন যে, শ্রমিকের সংগঠনের শক্তি দেখানোর এটা একটা সুযোগ। কারামুক্তদের প্রতি স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত এই ভাবেই স্থির হল।

কারখানায় আর শ্রমিকদের ঘরে ঘরে জোর প্রচার হল, বুড়ো থেকে বাচ্চা পর্যন্ত সবারই কারামুক্তদের দেখার আর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের আগ্রহ জাগল। নিজের ভাইদের স্বাগত সভায় যাওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে আম্মা সব কাপড় চোপড় ধুইয়ে কেচে নিয়েছে।

সে জোসেফকে জিজ্ঞাসা করে—

'এখানে এসে তারপরেই ত' ওরা সভায় যাবে। তাই না?'

'না, আমার ত সেরকম মনে হচ্ছে ন.।'

'তবে আমাদের আগেই গিয়ে সে'ানে পেঁীছতে হবে। তারপর এদিকে এলে দেখা হবে।'

'হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গেই যাব'খন।'

দুপুরে রোগা লোকটি এল। একটা টাকা সে আন্নার হাতে দেয়। আন্না জিজ্ঞাসা করে—

'আজ এরকম কেন?'

'এ্যান্টনী আর রোকি আসছে। ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা ত' করতে হবে। তাই না?'

'তা, দাদার ছেলেও ত' আসছে।'

'তার জন্যও দেওয়া আছে।'

'কখন আসবে ওরা?'

'সন্ধ্যে নাগাদ।'

'আমার যাওয়াও দরকার। তাই না?'

'যাওয়া ত' উচিত।'

মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল লোকটি। হঠাৎ মাথাটা উঠিয়ে বলল—

'বলার মতো কোনো বিশেষ কথা আছে কি?'

'কি কথা? জানতেই বা চাইছে কে? আচ্ছা, আবার কি ভাইদের ধরে নিয়ে যাবে?'—গলাটা তার ধরে এল।

'না, না! আমি তা বলছি না।'

'তবে কি?'

'কি যে সেটা, এখনও ঠিক প্রকাশ করা যাচ্ছে না। কোনও রকমের কথাবার্তা—কারখানা এবং মালিকের বাংলোয় চলছে।'

'আমার প্রার্থনা যেন ভাইদের আবার আটক না করে। তারপর

যা কিছুই হোক, আমি আর পরোয়া করি না।' চোখ মুছতে মুছতে আন্না লোকটির দিকে তাকাল।

স্থিরদৃষ্টিতে সে আন্নাকে দেখছিল। হঠাৎ মুখটা নামিয়ে ধীরস্বরে আন্না প্রশ্ন করে—

'দাদারা যখন আসবে, তখন থাকবেন ত আপনি এখানে?' 'হ্যাঁ'—মাথাটা হেলিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। পরে হঠাৎ চলে গেল।

গলির মাথায় পেঁৗছে ঘুরে একবার তাকাল। আন্না ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

আন্না চাল, টেপিয়োকা[১], মাছ ইত্যাদি সব কিনল। তারপর কঞ্জি বানিয়ে ফেলল। টেপিয়োকার খাবার তৈরী করল। মাছের ঝোল রাঁধল। কিন্তু নিজে সে কিছুই খেল না। আজ দাদাদের খাবার পর যা থাকবে তাই সে খাবে।

ধোওয়া পরিষ্কার কাপড় ও চোলী পরল সে। দাদাদের দেখার জন্য, তাদের অভ্যর্থনা সভায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। গলি থেকে জোসেফ বুড়োর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

'কিরে মেয়ে, এলি না এখনও?'

'হ্যাঁ দাদা। এই আসছি। একটু দাঁড়িয়ে যাও।'

গলিতে নেমে জোসেফের সঙ্গে যায়। খুব খুশী মনে দুজনে তাড়াতাড়ি হাঁটছিল—জোসেফের দেখা হবে তার ছেলের সঙ্গে আর আন্নার তার দাদাদের সঙ্গে।

গলি দিয়ে বড় রাস্তায় পেঁৗছতে ওরা দেখতে পেল যে রবীন্দ্র মশাইয়ের কারখানার মিস্ত্রী, চায়ের দোকানী সনি, আর তিন-চারজন লোক দাঁড়িয়ে। মিস্ত্রী হেসে জিজ্ঞাসা করল—

'দাদা আর মেয়ে মিলে চললে কোথায়?'

জোসেফ জবাব দিল—

১। এক ধরনের গাছের মূল।

'আজ ওরা আসছে। ওদিকেই যাচ্ছি। মিছিল আর সভাও হবে।'

'চুপচাপ যাচ্ছো কেন?'

'কি আর বলব, মিস্ত্রীমশাই?'—আন্না ধীর স্বরে বলে। 'হ্যাঁ, যা, চলে যা'—মিস্ত্রীর চোখ দিয়ে একটা চাপা আক্রোশ ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

জোসেফ আর আন্না এগিয়ে যায়। পেছনে অট্টহাসি শুনে ওরা ফিরে তাকাল। মিস্ত্রী আর তার সঙ্গীরা ওদের দিকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করে হাসি মস্করা করছে।

শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়েছে। সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি উঠছিল। ওরা দুজনে ছুট্ লাগাল ওদিকে।

ওই, ওই ত ওরা আসছে। হাজার লোকের সামনে ওরা আর সবাই ওদের স্বাগত জানাচ্ছে। জোসেফের কেবল দুঃখ যে ছেলের বুকে বুক ঠেকিয়ে সে কাঁদতে পারছে না। আন্নার আক্ষেপ যে দাদাদের সামনে ফুঁপিয়ে কান্না তার হল না। ভিড় ঠেলে দুজনে তারা এগিয়ে গেল—ছেলে আর দাদাদের কাছাকাছি হওয়ার জন্য। কে একজন বলে ওঠে—

'ওই ত' এ্যান্টনীর বোন।'

সবাই ওকে রাস্তা ছেড়ে দিল। একেবারে সামনের সারির ঠিক পেছনেই জায়গা পেল। জোসেফ আন্নার কানে কানে বলে—

'এখন বলিস না মেয়ে কথাটা।'

'কি কথা?'

'মায়ের খবরটা এখন ওদের জানানো ঠিক হবে না।'

মাথা নুইয়ে ওরা আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। এ্যান্টনী, রোক্কি, কোচ্চায়প্পন, মাত্রায়ি আর শৌরী আগে আগে যাচ্ছিল। ওরা লাল মালা পরে ছিল আর তাদের মাঝে ছিলেন নীলকণ্ঠন। ওর গলায় ছিল রক্তহারের গোছা। মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে জোরে

উনি ধ্বনি দিচ্ছিলেন—

'ইনক্লাব—জিন্দাবাদ!'

পদ্মনাভন, অচ্যুতন, জোসেফ আর শঙ্কু সেই আওয়াজের প্রতিধ্বনি তুলছিল। অন্যেরা প্রতিধ্বনি করতে পারছিল না। তারা ত কথাটার অর্থই বোঝেনি।

'ও কথাটা কি?' একজন শ্রমিক পাশের সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করল।

'কোনটা?'

'ইনক্লাবের অর্থ কি?'

'বড় একটা কিছু হবে।'

'জমিদার, পুঁজিপতি—সাম্রাজ্যবাদীদের বিনাশ হোক।' আবার ধ্বনি তুললেন নীলকণ্ঠন।

পদ্মনাভন আর সঙ্গীরাই সে আওয়াজে সুর মেলাল। কমরেড নীলকণ্ঠন সরোষে পেছন দিকে তাকালেন। পদ্মনাভন তার কানে কানে বলল—

'বুঝতে পারছে না বলেই ওরা আওয়াজে সায় দিচ্ছে না।'

'সর্বদেশের শ্রমিক সংগঠিত হও'—আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ ওঠালেন কমরেড নীলকণ্ঠন।

হাজার কণ্ঠে তার অনুরণন জাগল।

'পুঁজিবাদ নিপাত যাক্।'

সবাই প্রতিধ্বনি করল কথাটার।

'বিপ্লবের জয় হোক।'

সে কথারও প্রতিধ্বনি জাগল।

শহরসুদ্ধ কেঁপে উঠল। রাস্তায় দাঁড়ানো দর্শকদের মধ্যেও যেন এক আতঙ্কের ছাপ। কে একজন প্রশ্ন করে—

'বিপ্লবের মানে কি?'

কাছে দাঁড়ানো শিক্ষিত একটি লোক জবাব দিল—

'অর্থ এই যে পুঁজিপতি, পুলিশ আর অফিসারদের মার দেওয়া দরকার।'

দুজনেই হেসে উঠল।

জনস্রোত সমুদ্র প্রবাহের মতো ময়দান অভিমুখে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকে তৈরী করা মঞ্চে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া বন্দীদের সঙ্গে কমরেড নীলকণ্ঠন গিয়ে উঠলেন। আন্না আর জোসেফ বুড়ো মঞ্চের কাছেই দাঁড়াল এসে। হাজার লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কমরেড নীলকণ্ঠনের দিকে।

সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ ফিসফিসিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে বলল—

'খুব লেখাপড়া জানা লোক।'

'বাড়ীতে তো হাতী রয়েছে।'

'পড়াশুনার জন্য দেওয়ানও হতে পারতেন, কিন্তু গরীবদের উদ্ধারের জন্য সব ছেড়েছেন।'

কমরেড নীলকণ্ঠন গভীরভাবে চারিদিক দেখছিলেন। সকরুণ হাসি হাসলেন। পেছনে ঘুরে আস্তে আস্তে কিছু বললেন। পদ্মনাভন মঞ্চে উঠে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই সমুদ্রের দিকে একবার তাকাল। থর থর করে কেঁপে উঠল তার সারা শরীর। যেন কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু মুখে কথা জোগাল না।

কমরেড নীলকণ্ঠন গলার রক্তহার খুলে সদৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। পদ্মনাভনকে পেছনে সরিয়ে তিনি নিজেই সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'বন্ধুগণ' !—তিনি তাঁর ভাষণ শুরু করলেন।

সভার এক কোণায় হঠাৎ এক গোলমাল সৃষ্টি হল, রুদ্ধ কণ্ঠে একজন চেঁচিয়ে উঠল—

'এ্যাণ্টনী আর রোক্কির······' কিন্তু আর আওয়াজ বেরুল না তার।

দ্বিতীয় আর এক ব্যক্তি পুরো করল কথাটা—'বাড়ীতে আগুন

লেগেছে। মিস্ত্রীই আগুন লাগিয়েছে।'

'হায়'—চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল আন্না। শরীর তার অবসন্ন বোধ হচ্ছিল। সে এ্যাণ্টনীর তুহাতের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল।

মাত্রায়ি আর সাইমন বুড়ো জোসেফকে সামলাল।

জনসমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছিল।

'জায়গা ছেড়ে কেউ উঠবেন না। নড়াচড়া করবেন না কেউ' মেঘমন্দ্রস্বরে গর্জে উঠল কমরেড নীলকণ্ঠনের কণ্ঠস্বর। কেউ নড়ল না।

'রোক্কি কোথায়?' এ্যাণ্টনী জিজ্ঞাসা করল। ধারে কাছে কোথাও রোক্কিকে দেখা গেল না।

[16]

এ্যাণ্টনী আর মাত্রায়ির ঘরে আগুন লাগিয়েছিল মিস্ত্রী আর তার সাঙ্গোপাঙ্গের দল। ছোট মালিক মশাইয়ের আদেশে আগুন লাগানো হয়েছে।

কারখানায় গণ্ডগোল আর গোলমাল পাকানোর দলের এই স্বাগত সাড়ম্বর সম্বর্ধনা—এত সব ছোট মালিক সহ্যই বা করেন কি করে? ছোট মালিক তাই স্থির করেছিলেন যে, সম্বর্ধনাসভা যখন চলবে তখন এইসব চালাঘরগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। কারণ একটু বাদে ত ওখানেই সব শুতে আসবে।

এমন যে একটা কিছু ঠিক হয়েছে সেটা বড় মালিকমশাই শুনেছিলেন। তবে এসব ব্যাপারে যেতে ছেলেকে মানা করেছিলেন। তিনি আর ওসেপ মিলে কারখানা শুরু করেছিলেন—টাকাটা তাঁর,

এবং চেষ্টা চরিত্র যা কিছু ওসেপের। তারপর তিনি ত বাংলো-বাড়ীর মালিক হলেন আর ওসেপ হ'ল তাঁর জমির প্রজা। মালিক মশাইয়ের সব কথাই মনে পড়ল। মনের ভেতরটা হু হু করে উঠল। ছেলেকে তিনি বললেন—

'এসব কাজ করলে পাপ হয়। এরা আমাদেরই শ্রমিক, আমাদেরই জমির প্রজা। ওই বাড়ীতেই ওদের বাস করতে আর মরতে দাও।'

'তা, বাবা। তুমি যেমন আমায় উপদেশ দিলে, ওরাও ওদের ছেলেদের সেভাবে পরামর্শ দেয় না কেন? কেন ওরা বলে না যে, কারখানায় গণ্ডগোল বাধানো উচিত নয়? বলে না কেন যে মালিকের অন্ন খাচ্ছে তারা, তারই জমির জল নিচ্ছে আর তার তৈরী ঘরেই বাস করছে?'

'ছেলেরা যদি বিগড়ে যায়, তাহলে বেচারা বাপের কি দোষ?'

'যদি ছেলেরা নষ্টই হয়ে থাকে, তবে তাদের শুধরে ঠিক করার উপায় আমার জানা আছে।'

'কিন্তু ভগবান রুষ্ট হবার মত পাপ কাজ করা অনুচিত।'

'কিন্তু আমাদের জমিতে বাস করে আমাদেরই ক্ষতি করবে সেটাই ত পাপ।'

ছেলের সঙ্গে তর্কে পেরে উঠলেন না বড় মালিকমশাই। কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মার যন্ত্রণা হচ্ছিল।

সেই রোগা লোকটি গোড়া থেকেই আশঙ্কা করছিল যে একটা কিছু ঘটবেই। কুট্টপ্পনের চায়ের দোকানে বসে সে বেশ বুঝতে পারছিল যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তাই সব শ্রমিক যখন শোভাযাত্রা ও সভায় চলে গিয়েছিল, সে তখন আন্নার ঘরের কাছাকাছি লুকিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল।

সন্ধ্যার সময়ে মিস্ত্রী আর সাঙ্গোপাঙ্গরা দুটো দলে ভাগ হয়ে এ্যান্টনী আর মাত্রায়ির ঘরে চড়াও হ'ল। মিস্ত্রী যখন এ্যান্টনীর

ঘরে ঢুকল, তখন সেই রোগা লোকটিও তার পেছন পেছন ঢুকল। মিস্ত্রী দেশলাই জ্বেলে আগুন জ্বালাল। রোগা লোকটি সেই আগুন নিভিয়ে দিল।

হঠাৎ তার গালে একটা থাপ্পড় এসে পড়ে। মাটিতে পড়ে গেল সে। আর পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলল লাথি ও মার।

'একে নিয়ে গিয়ে নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধ'—আদেশ দিল মিস্ত্রী।

বেহুঁশ সেই রোগা লোকটিকে নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধা হ'ল। প্রতিবেশীদের মধ্যে মেয়েরাই কেবল সে সময়ে ছিল। কেউই তারা সাহস করে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তারা চীৎকার চেঁচামেচি করতেও ভরসা পায়নি। কেবল বেলায়ুধনের মা লুকিয়ে গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। আগুন লাগাবার খবরটা এভাবে সভা পর্যন্ত পোঁছায়।

কমরেড নীলকণ্ঠন বুঝিয়েছিলেন যে, সভা চলাকালে বাড়ীঘর জ্বলে যাক্, ভূমিকম্পই হোক, শ্রমিকদের অবিচলিত অবস্থায় নিয়মানুবর্তিতা রেখে যেতে হবে। এটা তাদের নিয়মনিষ্ঠা রাখবার একটা পরীক্ষা বিশেষ। শ্রমিকরাও আপন নেতার আদেশ পালন করলো।

রোক্কি বিদ্যুৎ গতিতে সভামঞ্চ থেকে উধাও হয়ে গেছে। আন্নার হাতধরা এ্যান্টনী এবং জোসেফের চলনদার মাত্রায়ি আর সাইমন চলে গেল সেখান থেকে। মেঘমন্দ্রস্বরে কমরেড নীলকণ্ঠন বলে ওঠে—

'দুনিয়ার শাসনযন্ত্র দখল বা নির্দেশের অধিকার শ্রমিকের রয়েছে। কারণ এ পৃথিবীর যাবতীয় ধনদৌলত এবং সংস্কৃতির স্রষ্টিকর্তা হলো শ্রমিকরাই।'

আন্না এ্যান্টনীর হাত ছাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললো—

'বড়দা, আমিও যাব?'

'কোথায় ?'

'আমাদের বাবা মা যেখানে গেছে ?'

হঠাৎ খেয়াল হল আন্নার। সে থেমে থেমে বলল—

'মা ? মা···মা-ও সেখানে।'

'কি, মা সেখানে ? ···আছে·· আছে ?' দৌড়লো এ্যান্টনী। আন্নাও ছুট দিল।

শিকার মেরে খাওয়াদাওয়ার পর সিংহ যেমন চুপচাপ শুয়ে থাকে, আগুনটাও তেমনিভাবে জ্বলছিল। নিভন্ত আগুনের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে নারকেল গাছে বাঁধা লোকটির কাতরানি-গোঙানি থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে।

'মা! হায় মাগো'—বলে চীৎকার করতে করতে এ্যান্টনী জ্বলন্ত অঙ্গার মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

'বড়দা, ও বড়দা!' পিছন থেকে আন্না এ্যান্টনীর গলা জড়িয়ে ধরল, গলিতে দাঁড়ানো মেয়েরা সকলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'কোথায় ? আমার মা কোথায় ?' এ্যান্টনী জিজ্ঞাসা করল।

'মা ? বড়দা, মা ত চলে গেছে। বাবাকে কঞ্জি তৈরী করে দেবার জন্য গেছে।'

এ্যান্টনীর সংজ্ঞা লুপ্ত হল। আন্না তার বড়দাকে সামলে ধরে শোয়াল।

'আন্না।'—একটা গোঙানি শোনা যাচ্ছে।

ঘাবড়ে গিয়ে এপাশ ওপাশ তাকাল আন্না।

'কে ? এ কে ?'

'আন্না'—আবার সেই চাপা আওয়াজ।

আন্না উঠে দাঁড়াল। যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল সেদিকে সে এগিয়ে গেল।

'হায়, এ কি ব্যাপার ? হায় প্রভু!'—সেও জ্ঞান হারাল।

'পথ ছেড়ে দাও! রাস্তা দাও!' চাপা গুঞ্জন শোনা গেল গলিতে।

'বড় মালিক মশাই আসছেন। বড় মালিক মশাই!'

বৃদ্ধ রবীন্থু মশাই লাঠিতে ভর করে আসছিলেন। সবাই পথ ছেড়ে দিল। কেউ কিছু বলল না। এ্যান্টনীর পাশে এসে খুঁটিয়ে তাকালেন তিনি।

'হায় ভগবান!' ওপর পানে তিনি চোখ তুললেন। চোখের জল মুছলেন।

বেলায়ুধনের মা এ্যান্টনীর মুখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। চোখ খোলে এ্যান্টনী।

'এ কে? বড় মালিক মশাই?' আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল।

সে উঠে বসল। বেলায়ুধনের মাকে জিজ্ঞাসা করে—

'আমার মা কোথায়?'

মুখ ফিরিয়ে কান্না চাপার চেষ্টা করল বেলায়ুধনের মা। উঠে আন্নার কাছে যায় এ্যান্টনী। আন্নার মুখেও জল ছিটিয়ে দিল বেলায়ুধনের মা। সেও ধীরে ধীরে চোখ মেলে। সেই রোগা লোকটি তখনও কাতরাচ্ছিল। এ্যান্টনী তার বাঁধন কেটে দিল। তারপর ধীরে নিয়ে শোয়ালো তাকে। আন্না তার পাশে এসে বসে। সে লোকটির চোখেমুখে জল দিল। গালের যেখানে মেরেছিল, সেখানটা আন্না আস্তে আস্তে মালিশ করে, এ্যান্টনী মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

হঠাৎ এক বিকট আওয়াজ। যেন বিরাট সৈন্যদলের আক্রমণের ভয়ঙ্কর একটা শব্দ।

ঘাবড়ে এ্যান্টনী বড় মালিক মশাইয়ের কাছে গিয়ে বলল—

'হুজুর, আপনি আর এখানে থাকবেন না।'

'থাকলে দোষটা কি?'

'সভার শেষে লোকেরা ফিরছে। হুজুর, আপনি আর থাকবেন না এখানে। যান, চলে যান মালিক।'

মালিক মশাই গলিতে পেঁৗছে হাঁটতে শুরু করলেন।
সে সময় শঙ্কু হাঁপাতে হাঁপাতে এল আর এ্যাণ্টনীকে বলল—
'মিস্ত্রী মর মর। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে।'
'রোক্কি কোথায়?'
'ওহ্।'

[17]

বাড়ীতে আগুন লাগার কথা শুনে রোক্কি সভাস্থল থেকে দৌড়ে চলে এসেছিল। কিন্তু গলি থেকে একবারই মাত্র সে বাড়ীর দিকে তাকাতে পেরেছে। বাড়ী ত' পুড়ে ছাই। প্রতিবেশী মেয়েরাও সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। রোক্কি জিজ্ঞাসা করল—

'আমার মা কোথায়?'

জবাব দেয়নি কেউ। এখন পর্যন্ত এ্যাণ্টনী বা রোক্কি কেউই এলীর মৃত্যু সংবাদ জানত না। ইচ্ছে করেই জেলে থাকাকালীন তাদের খবরটা দেওয়া হয়নি।

'মা'—জোরে হাঁক দিল রোক্কি। গলি থেকে সে বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

বেলায়ুধনের মা তাকে আটকাল।

'বাছা, তোর মা চলে গেছে।'

'কোথায়? গেছে কোথায়?'

'চলে গেছে।'

'আমি জানতে চাইছি কোথায় গেছে?'

'চলে গেছে, বাছা। চলে গেছে।'

'মা—মা' বলে চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে পোড়া বাড়ীর চারধারে রোক্কি ছুটে বেড়াতে লাগল।

নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধা রোগা লোকটির গোঙানি ভেসে এল একবার। কিন্তু রোক্কি দেখতে পায়নি।

'মা···া···া···' গলিতে উঠে এসে পাগলের মত দৌড়াতে লাগল রোক্কি।

বেলায়ুধনের মা তার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

'বাছা, মা তোর ওই ওপরে স্বর্গে চলে গেছে।'

'কি, মেরেছে মাকে ? আমার মাকে মেরে ফেলেছে ?'—আবার সে দৌড়াল। মৃতা মাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। গলি ধরে বড় রাস্তায় এসে অনেকখানি দৌড়ানোর পর আবার একটা গলিতে এসে পৌঁছাল। কোথায় যাচ্ছে সে কিছুই জানে না। খুব জোরে জোরে চলছিল সে। অন্ধকার সেই গলিপথে লোকজন দেখা যাচ্ছে না। একটা বাড়ীতে শব্দ শুনে তার খেয়াল হল। সেটা মিস্ত্রীর কণ্ঠস্বর। একটা আরাম কেদারায় শুয়ে, তার স্ত্রী ও ছেলের সব কথাবার্তা সে শুনেছিল—

মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই না পেয়ে যারা এক সময় ঘুরছিল, তাদেরই বড় মালিকমশাই ঘর বানিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর তাদের কাজও দিয়েছিলেন কারখানায়। এখন সেসব লোকই মালিকের ক্ষতি করতে লেগে গিয়েছে। মালিকের জমিতে ঘর বানিয়ে বাস করে, তারই দেওয়া কঞ্জি খেয়ে তারই পেছনে লাগবে—তা হতে দেব না। হুঁ। এরা সভা করছে—মালিককে গালাগাল দেবার জন্যে। আর ভাবছে এরা সভার শেষে গিয়ে মালিকের বানানো সেই ঘরেই আবার আরামে ঘুম লাগাবে। তা চলবে না।

মিস্ত্রীর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে—

'আগুন লাগাবার সময় ঘরটিতে কি সেই মেয়েটাও ছিল ?'

'না, সেও সভায় চলে গিয়েছিল।'

হঠাৎ রোক্কি ঢুকে পড়ল সে বাড়ীতে। মোমবাতির আলোয় আরাম কেদারায় শোয়া সেই মিস্ত্রীর বুকে সে ঘুষি মারল। তারপর মিস্ত্রী উঠে বসা বা আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করার আগেই সে আরও চার পাঁচটা ঘুষি চালালো। মিস্ত্রীর ছেলে আর বৌ জোরে চেঁচিয়ে উঠল। বউ মাঝে পড়ে থামাতে যাওয়ায় তার ওপরও দু-তিনটা থাপ্পড় এসে পড়ল। প্রতিবেশীরা এসে পেঁীছানোর আগেই রোক্কি চেয়ার থেকে মিস্ত্রীকে মাটিতে ফেলে আরও চার-পাঁচ বার লাথি মারে।

'এরপরে আর কারো বাড়ীতে এভাবে আগুন লাগাবে না' এইকথা বলে রোক্কি সেখান থেকে সরে পড়ল।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন আচমকা ঘটে গেছে। রোক্কি আদৌ চিন্তা করেনি যে, সে মিস্ত্রীর বাড়ী গিয়ে চড়াও হবে বা তাকে মারবে। গলিতে পেঁীছে সে দৌড়াতে লাগল। চীৎকার চেঁচামেচি শুনে এগিয়ে আসা এক প্রতিবেশীর সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল। সেই প্রতিবেশী চেঁচিয়ে ওঠে—

'ওই, ওই চোর পালাচ্ছে।'

আরও জোর দৌড় লাগাল রোক্কি—সামনের একটা বেলে মাটির টিলার ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বসে পড়ল সে মাটির ওপর। ভয়ে মুখ তার শুকিয়ে গেছে। জেল থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত এক-কাপ চা-ও সে খায়নি। এক ভাঁড় চা আর একটা বিড়ি যদি পাওয়া যেত!

উঠে হাঁটতে শুরু করল রোক্কি। বন বাদাড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পেঁীছাল। কিছুদূর এগিয়ে দেখে একটা চায়ের দোকান। কিন্তু সেটা বন্ধ। দোকানের বারান্দায় এসে সে বসে পড়ে। ওঃ, তেষ্টা পেয়েছে। চারদিকে তাকাল সে। চা-তৈরির টেবিলের নীচে একটা ঘড়া। ঘড়াটা তুলে দেখল। জল রয়েছে।

একটু মুখে দিল সে। জলটা খারাপ নয়। শেষে জলটুকু সব খেয়ে নিল। বারান্দায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমও এসে গেল।

ভোর হতে দোকানদার তাকে ঠেলেঠুলে ওঠাল। দোকানদার তার দোকান খুলেছে। উনুন ধরিয়ে জল গরম করার জন্য চাপাল। কিছুক্ষণের মধ্যে চা তৈরী। এক ভাঁড় চা! কিন্তু রোক্কির কাছে পয়সা নেই। তার কোনও পরিচয়ও নেই দোকানীর সঙ্গে।

সে বড় রাস্তায় উঠে আসে। শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করে। আগের দিনের যাবতীয় ঘটনা তার মনে পড়ে। সেই বিরাট মিছিলের সামনে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যাওয়া! শ্রমিকদের সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকানো। জন সমুদ্রের মুখোমুখি হয়ে সভামঞ্চে বসা। ভাষণে কি বলবে সেই চিন্তা!

মনে মনে কি ছকে নিয়েছিল সে তার ভাষণ? সভাধ্যক্ষ নাম ধরে ডাকলেই সে উঠে দাঁড়াবে। আর তখন বিরাট সেই সভায় এভাবে সে বলবে—

'তিলে তিলে মরার চেয়ে একসঙ্গে আমাদের শেষ হয়ে যাওয়াই ভালো। কারণ……'

হঠাৎ হাততালির আওয়াজে রোক্কি পেছনে তাকাল। সড়কের ডানপাশে একটা কাজুগাছের তলা থেকে শঙ্কু হাততালি দিয়ে রোক্কিকে ডাকছিল—

'এ পাশে আয়।'

ঘাবড়ে গিয়ে রোক্কি দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একটু আয় না এদিকে।'

রোক্কি শঙ্কুর কাছে গেল। শঙ্কু আস্তে আস্তে বলল—

'ওদিকে তোর যাওয়া ঠিক হবে না।'

'গেলে কি হবে?'

'গেলে?……আমি বলছি, এসময়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'কি হবে গেলে?'

'পুলিশ টহল দিচ্ছে। এ্যান্টনী, মাত্রায়ি, সাইমন, অচ্যুতন, পদ্মনাভন, জোসেফ আর পপ্পনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।'

'কেন?'

'মিস্ত্রীকে ওরা মেরেছিল।'

'আমি ত' ঘুষি মেরেছি মিস্ত্রীকে।'

'তুই?······তবে পুলিশ বলছিল যে এরাই মেরেছে।'

'তাহলে যাই সেখান অবধি? আমি গিয়ে বলব যে ঘুষি আমিই মেরেছি। আমার বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাই ঘুষি মেরেছি আমি।'

'না, না, তোর যাওয়া এখন ঠিক হবে না। ওরা মারবে তোকে।' 'আমায় মারতে চায় মারুক। আমি চললাম সেখানে।'

'যাবি না, রোক্কি! আমি বলে দিচ্ছি যাবি না। ওদের পিটিয়ে তক্তা করে দিয়েছে পুলিশ। তুই গিয়ে পড়লে ওরা তোকেও মেরে ফেলবে।'

জোর করে সে রোক্কির হাতটা চেপে ধরল। শঙ্কুর হাতের চাপে একটু দমে গেল সে। জিজ্ঞাসা করল—

'তাহলে কি করা যায় এখন?'

'তুই থাক্ এখানে। আমাদের একটা সংঘ আছে। তার নেতাও আছে······আচ্ছা আগে ত এককাপ চা খেয়ে নে।'

শঙ্কু রোক্কির হাত ধরে এগোয়। রোক্কি প্রশ্ন করল,

'কি, আমার মাকে তুমি দেখেছো?'

'তোর মা?······উনি তো স্বর্গে চলে গেছেন—তোর বাবাকে কঞ্জি বানিয়ে দেবার জন্য।'

আর কিছু বলল না রোক্কি। তারা চায়ের দোকানে গিয়ে পৌছাল। দুজনে চালের গুঁড়োর পিট্টু[১] আর চানা ছোলা খেল। চা-ও খেল। রোক্কি একটা বড় বিড়িও খেল।

১। মোদকের মত একধরনের খাদ্যবস্তু।

ওরা সড়ক ধরে চলেছে। রোক্কি জিজ্ঞাসা করে—

'আমার ছোট বোনটি কোথায় ?'

'আন্না ? —সে ত ওখানেই।'

'কোথায় ?'

'নতুন বাড়ীতে।'

'নতুন বাড়ী এল কোত্থেকে ?'

ছুটি ঘর জ্বলে যাওয়ার পর সে জায়গায় নতুন বাড়ী উঠেছে—তাও চাইবার আগেই।

কথাটা সত্যি। পোড়া তুই ঘরের জায়গায় ভোর হওয়ার আগেই তুটো ঘর উঠেছিল। মারপিট আর লাথালাথি সয়েও সেই রোগা লোকটি ল্যাংচে ল্যাংচে হাঁটছিল আর শ্রমিকদের কানে কানে কিছু বলছিল। পদ্মনাভন বলল—

'ভোরের ভোঁ পড়ার আগেই নতুন ঘর তৈরী হওয়া চাই।'

জোসেফ বলল—

'পুরানো কিছু নষ্ট হলে নতুন কিছু তৈরী হওয়াও দরকার।' সবাই সে কথায় স্বর মেলাল। কি জানি কিভাবে নারকেল পাতা, বাঁশ—দড়ি সবই এসে গেল। সূর্যোদয় হবার আগেই তুটি ঘর তৈরী হয়ে গেছে।

আন্নার হাত ধরে এ্যাণ্টনী নতুন ঘরে গেছে। গদগদ কণ্ঠে সে বলল—

'পুরানো সবই গেল—মা, বাবা, ঘর আর সবই। এগিয়ে গেলেই তবে নতুন খেলা—নতুন খেলা!'

সকাল হতেই পুলিশের দল এল। তারা এ্যাণ্টনীর হাতে হাতকড়া পরাল।

'এ আবার কেন ?'—জিজ্ঞাসা করল এ্যাণ্টনী। একটা ঘুষি এসে পড়ল আচমকা—সেটাই হল জবাব।

'হায় প্রভু!' মাটিতে ঘুরে পড়ে গেল আন্না।

[18]

মাত্রায়ি আর সাইমন ওসেপের মৃতদেহ নিয়েই নতুন ঘরে এসেছে। শব-সংকার না করতে দিয়েই এদের দুজনকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেছে। বেলায়ুধনের মায়ের একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। গলার মধ্যে আটকানো কফের দলা বার করতে করতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—

'ও আমার কনিচ্চ কোলঙ্গরের[১] ভগবতী'!

পদ্মনাভন, অচ্যুতন, জোসেফ, এ্যাণ্টনী আর সাইমনকে পুলিশ হাতকড়ি পরিয়ে খালি পায়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জনতার একটা বড় ভিড় তাদের পেছনে পেছনে। সেই রোগা লোকটিকেও ভিড়ের মধ্যে চকিত এক একবার দেখা যাচ্ছিল।

পুলের পাশে পুট্টু বিক্রেতা এক বুড়ী একটা রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে—

'এরা গতকালই জেল থেকে ছাড়ান পেয়েছিল না?'

'হ্যাঁ'

'তাহলে আজ আবার কেন এদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে?'

'মিস্ত্রীকে ঘুষি মেরেছে, সে ত এখন হাসপাতালে।'

'কোন্ মিস্ত্রী?'

'রবীন্দ্র মশাইয়ের কারখানার মিস্ত্রী।'

'এরা সব মিস্ত্রীকে ধরে কিল ঘুষি মেরেছে?'

'সবাই বলছে যে, মিস্ত্রী এদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

১। দুর্গা মন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত একটি স্থানের নাম

'তাহলে মিস্ত্রীকে মার ধোর করলেই আবার ঘর তৈরী হয়ে যাবে?'

'মিস্ত্রীকে কিলঘুষি মারাও হল, ঘরও উঠল।'

'মালিক আর মিস্ত্রীকে ধরে যদি মারে?'

'মারধোর করেছে ত' কি হয়েছে?'

'ভগবান এসব পছন্দ করেন না।'

'ওরা ত বলে যে ভগবান নেই।'

'তাই ত এভাবে চলছে ওরা।'

'যীশুকেও এভাবে হেনস্তা হতে হয়েছিল।'

'কি, প্রভু যীশু আর বক্কির ছেলে এ্যাণ্টনী একই হল?'

'তা তফাৎটা কোথায়?'

'চুপ করে যাও ভাই। তুমি ভগবান আর এ্যাণ্টনীকে এক বানিয়ে দিচ্ছ। পাগল হয়ে গেলে তুমি। শ্রমিকেরা যখন মালিক আর মিস্ত্রীর সামনে আসে···তখন···'

'কি, পেন্নাম জানাতে হবে?'

'হ্যাঁ, তা না হলে সেটা গুরুজনকে অশ্রদ্ধা করা হয়ে দাঁড়ায়, মালিক আর মিস্ত্রী রয়েছে, তাই ত শ্রমিকের অন্ন জোটে।'

চা আর পান বিড়ির দোকানে, নৌকাঘাটে, বাস ষ্ট্যাণ্ডে, হাটে বাজারে—সর্বত্র গরম গরম খবর রটতে লাগল। সেই রোগা লোকটিকে গরম হাওয়ার মত সর্বত্র দেখা গেল। শ্রমিকদের কানে কানে সঙ্কেত পৌঁছে দিল সেই আঁধি। এক কারখানার ফটক থেকে আর এক কারখানায় যেন সে উড়ে বেড়াতে লাগল। কারখানার তাঁত আর দড়ির ফাঁকে ফাঁকে একটা সাড়া জাগল। কুট্টপ্পনের চায়ের দোকানে একটা চাপা আক্রোশ ফেটে পড়ছে। দাঁতে দাঁত চেপে চা ঢালছিল কুট্টপ্পন। টেবিলে গ্লাসও এমন জোরে রাখছিল, যা আগে দেখা যায়নি। তার প্রতিটি কথায় এবং সামান্য হ্যাঁ-এর মধ্যেও রাগের আভাষ।

সনির চায়ের দোকানে ত একটা আক্রোশ থেকে থেকে ফুঁসে উঠছে। গর্জিয়ে উঠছিল সনি—

'ইষব হোক—না-ই হোক—সবাইকে মারধোর করছিল, খৃষ্টানেরা কিন্তু মারামারিতে যাবে না। এই খৃষ্টানদের হাতে তুটো পয়সা হয়েছে দেখে ইষবদের চোখ টাটাচ্ছে।'

তখন বিড়ির দোকানের বাসু হাতের কাঁচি উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

'তাহলে পুলিশ খৃষ্টান কজনকে গ্রেপ্তার করল?'

'কে বলল ওরা খষ্টান? ওরা ত ইষবই। খৃষ্টানেরা মারপিট করবে না।'

ব্যঙ্গ করে বাসু প্রশ্ন করল—

'তবে কি খৃষ্টানদের ঘর জ্বালিয়ে দেবে?'

'ঘর ত ইষবরাই জ্বালিয়েছে।'

'তাহলে তুমিও ইষব।'

ছুরি হাতে দোকান থেকে লাফিয়ে নেমে এল সনি।

বাসুও কাঁচি চেপে ধরে দাঁড়িয়ে।

কুট্টপ্পনের দোকানে চা পানরত সেই রোগা লোকটি এসময়ে একজন শ্রমিকের কানে কানে কিছু বলে পলকে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সনি আর বাসুকে যারা ছাড়াতে এসেছে শ্রমিকটি তাদের বলল—

'সরে যাও তোমরা সবাই। এরা তুজন ত তুই মালিকের পোষা গুণ্ডা। এরা আপোযে নিজেদের মধ্যে ছুরি ছোরা মারুক।'

শেষটায় সনি আর বাসু ছুরি আর কাঁচি নাচাতে নাচাতে নিজের জায়গায় এসে বসল।

* * * *

নৌকাঘাটায় অপেক্ষমাণ যাত্রীদের মনে একটা সন্দেহ—

'বিপ্লবের অর্থটা কি?'

একজন যাত্রী বলল—

'বিপ্লবের মানে সব পুঁজিপতিদের ধরে মারা।'

'মেরে তারপর যাবে কোথায়?'

'যারা মারছে, তাদেরই জিজ্ঞাসা কর সে কথা।'

অন্য একজন জিজ্ঞাসা করল—

'তাহলে মারছেই বা কেন?'

'পুঁজিপতিদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নেবার জন্য।'

'টাকা, কড়ি কেড়ে নিয়ে তারপর?'

'হুঁ।'

সেই রোগা লোকটি ব্যাপারটা সামাল দিতে পারে এমন একটি ভারী মালবাহী শ্রমিকের কানে কানে কিছু বলে উধাও হয়ে গেল। সেই ভারী মালবাহী শ্রমিকটি যাত্রীদের গিয়ে প্রশ্ন করল—

'কি জানতে চাইছো তোমরা?'

'আমরা যা যা জানতে চাই, তার যথাযোগ্য উত্তর কি তুমি দিতে পারবে?' —রেগে গিয়ে একজন যাত্রী শ্রমিকটিকে জিজ্ঞাসা করল।

'সব কিছু ত বলতে পারব না, মশাই! তবুও যদি......'

'যাও, পথ দেখো।'

কাজের লোকটি চলে গেলে অবজ্ঞা মিশিয়ে যাত্রীটি বলল—

'বড় এসেছেন রে, উনি আমাদের শেখাতে বোঝাতে।' সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আঁধারে ছেয়ে গেছে সব। আতঙ্কের একটা খবর ছড়িয়ে পড়ছিল শহরে। আন্নাকে বেলায়ুধনের মা বলেছে—

'শুনলাম ছোট মালিককে নাকি ইট মেরেছে।'

'কে?' উৎকণ্ঠিত আন্না প্রশ্ন করল।

'এ্যাঃ। পাথরটা মাথায় লেগে উনি চোট পেয়েছেন। কালো একটা পাথর নাকি ছুঁড়েছিল। সে সময়ে তিনি মোটর সাইকেল চড়ে যাচ্ছিলেন. আর গাড়ী থেকে ছিটকে গিয়ে দূরে পড়েন।

হাতটা ভেঙ্গে গেছে।'

একটুক্ষণ থেকে আন্না আবার জিজ্ঞাসা করল—

'ছোড়দা কি এদিকে ধারে কাছে কোথাও রয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

আকাশের দিকে তাকাল আন্না—

'হায় প্রভু!'

বেলায়ুধনের মা বলল—

'অন্ধকার হয়ে গেছে। চল্ মা, এখানে থাকা আর ঠিক হবে না।'

'আমি তাহলে যাব কোথায়?'

'চল্ বাছা, আমার সঙ্গে আয়।'

'না, না, আমি এখানেই থাকব।'

'একা?'

'হ্যাঁ, একাই। ছোড়দা এলে তবে……।'

'তাহলে বাছা, ভেতরে গিয়ে আগলটা দিয়ে আয়।'

বারান্দায় রাখা কেরোসিনের প্রদীপটা নিয়ে ভেতরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করল আন্না। বেলায়ুধনের মা চলে গেল।

বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল আন্না। আশেপাশের ঘরের প্রদীপের আলো দেখা যাচ্ছিল। এ্যান্টনীর ঘরখানাই আঁধারে তলিয়ে গিয়েছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। নৈঃশব্দ্যটা আরো ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে।

আকাশের দিকে তাকাল আন্না। আকাশের ওপারেই ত স্বর্গ। তার মা, বাবা রয়েছে সেখানে! হয়ত বা তারার ফাঁক দিয়ে মেয়েকেই দেখছে তারা। একাকী মেয়েকে হয়তো তারা ডাকছে।

গলির মুখে আচমকা একটা আওয়াজ শোনা গেল। সেদিকে ফিরে তাকায় আন্না। কেউ একজন আসছে। গম্ভীর গলায় আন্না জিজ্ঞাসা করল—

'কে আসে?'

'আমি'—সেই রোগা লোকটি ওর পাশে এসে দাঁড়াল। আন্নাকে জিজ্ঞাসা করল—

'কি, খেয়েছো কিছু?'

জবাব দিল না আন্না। তার দিকে একটা ঠোঙ্গা এগিয়ে দিল—

'এতে আছে সব। একটু খেয়ে নাও।'

ঠোঙ্গাটা নিয়ে আন্না বলে—

'এখন আমার কিছুই চাই না।'

'তাহলে আসি……।'

'খাননি কিছু?' —আন্নার প্রশ্নে উৎকণ্ঠার আভাষ।

'একটু কফি থাকলে—।'

'আচ্ছা বেশ। এখনই তৈরী করছি কফি। বসুন এখানে।'

'কফি কেবল আমার জন্যই নয়।'

'তাহলে কার জন্য?'

'আমাদের দুজনের জন্য।'

'ও।'

একটু নীরবতা। দুজনেই মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি বলল—

'আমি আসছি এখুনি।'

'যাবেন?'

'হ্যাঁ, চলে আসব এখুনি।'

চলে যাচ্ছিল সে, কিন্তু যায়নি। আন্নার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'আন্না'—সে ডাকলো।

'হুঁ?' মিষ্টি জবাব বেরিয়ে এল আন্নার গলায়।

দূরে একটা চীৎকার। বহুলোক যেন একসঙ্গে কান্নাকাটি চেঁচামেচি করছে। 'ব্যাপার কি?' —শঙ্কিত প্রশ্ন আন্নার—

'পুলিশ। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দাও।'

বিদ্যুৎগতিতে সে-ও উধাও হয়ে গেল।

[19]

সেদিন মাঝরাতে মুর্গীর ডাক শোনা গেল না। সেই ভয়ঙ্কর নীরবতা ভাঙ্গবার সাহস সম্ভবত মুর্গীরও নেই।

কেমন একটা অবস্থা। বাড়ীতে ঢুকে কিনা মিস্ত্রীকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে গেছে। মোটর সাইকেল করে যাবার সময় রাস্তায় পাথর ছুঁড়ে মেরেছে, তাই হাত ভেঙ্গে গেছে ছোট মালিক মশাইয়ের। পুঁজিপতি সবাই যেন সাবধান। শাসনব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে চলেছে। একটা তাণ্ডবনৃত্য চলেছে।

চালাঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা ভালো করে বন্ধ করে চৌকিতে মাতুর বিছিয়ে অন্ধকারেই আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল আন্না। তার মনে হল এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই শহরে একটা কিছু ঘটছে। আশঙ্কা হল হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই তার এই চালা-ঘরও আক্রান্ত হবে।

সে একা। দারিদ্র্য আর কষ্টের মধ্যে তার জন্ম! তবে মা-বাবা আর দাদাদের মধ্যে বড় হওয়ার জন্য দারিদ্র্য তেমন কিছু বুঝতে পারেনি। ছোটবেলাটা ভালোই কেটেছে। কিন্তু এই যৌবনের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হবার সময়েই আপদ-বিপদ আর কষ্ট যেন তার পিছু নিয়েছে। একটার পর একটা ঝঞ্ঝাট তাকে ঘিরে ধরছে।

মা যখন বাবাকে কঞ্জি বানিয়ে দেবার জন্য স্বর্গে যাবার কথা বলত তখন আন্না সেই পাগলামির অর্থ বুঝত। কিন্তু দাদা দুজন আর কারখানার গণ্ডগোল পাকানো আর মিস্ত্রী ও মালিকের

পেছনে পড়ল, সেই পাগলামির অর্থটা সে বুঝে উঠতে পারেনি। বোঝার তেমন একটা উৎসাহও নেই। যা মন চায়, তা তারা করুক, তবে বাধা বিপদ কিছু না ঘটিয়ে তারা রোজ বাড়ী ফিরুক—সেটাই তার একমাত্র প্রার্থনা।

সেই রোগা লোকটি! —তাকে ত আন্না একেবারেই বুঝতে পারেনি। কোথা থেকে সে এসেছে? কেন এসেছে? তার কি বাবা, মা নেই? বোনও নেই? তার মনে পড়ল যে মা লোকটিকে একদিন বলেছিল, সে 'মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।'

কথাটা কি ঠিক? মৃত্যুর পথে সে লোকেদের ঠেলে দেয়? তার ভাইদেরও কি সে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেবে? কিন্তু মরণের পথে ঠেলে তার কি লাভ? ......কে জানে? আন্না নিজে ত এসব কিছুই জানেন না।

রোগা শরীর, বড় মাথা, আর উজ্জ্বল চোখ! সেই জ্বলজ্বল চোখে শোকবিহ্বল স্নেহভাবও ভাঁটার মত দেখাত। কখনও মনে হয়েছে যে সামান্য একটা পিঁপড়েকেও এ লোক কষ্ট দিতে পারবে না।

উঠানে কারো যেন অল্প অল্প কাশির শব্দ শোনা গেল। আন্না কান খাড়া করল। বারান্দায় হঠাৎ চীৎকার শোনা গেল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল আন্না। জিজ্ঞাসা করল—

'কে?'

'আমি। দরজা খোলো।'

'কে? ছোড়দা?'

'হ্যাঁ।'

আন্না দরজা খুলে দিল। আবছা চাঁদের আলোয় রোক্কি মাথা নুইয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল আন্না—

'দাদা, এদিকে এলে কেন? পুলিশ ত পাগলা কুকুরের মতো হন্যে হয়ে ফিরছে।' গলা বুঁজে এল আন্নার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে

বলতে লাগল—

'দাদা, দাঁড়িও না এখানে। এখনই পালাও।'

'তুই এখানে···একা তুই···' দম বন্ধ হয়ে এল রোক্কির।

'ভগবান আমার সহায়। দাদা তুমি যাও।'

'কিছু খেয়েছিস্ আজ তুই?'

'ছোড়দা খাবে কিছু?'

'ভাত আছে?'

'হ্যাঁ। খানিকটা কঞ্জি তৈরী করি?'

'চাল পেলি কোথায়?'

'এনেছিল খানিকটা।'

'কে?'

'ওই···ওই···'

'হাওয়া?'

'হ্যাঁ।'

রোক্কি চুপ করে থাকল। দৃঢ়স্বরে আন্না বলল—

'দাদা, এবার যাও। দাঁড়িও না আর।'

'কি, পুলিশ এসে ঘুরে গেছে?'

'আসবে। আর এলে···। আর দেরী নয়। এসো এবার'—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল।

গলিতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘাবড়ে গিয়ে আন্না বলে উঠল—'ঐ, এসে গেল ওরা। এসো, দাদা, এবার এসো!'

উঠানে নেমে চলে যাওয়ার পথে সেই রোগা লোকটি এসে পৌঁছাল। সে জিজ্ঞাসা করল—

'কে? রোক্কি নাকি?'

'হ্যাঁ'।

রোক্কি এগিয়ে এসে হাত ধরল। আদেশের কণ্ঠে সে বলল—

'ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও।'

'এসো'—আবার রোক্কির হাত ধরে সে টানল।

এরা দুজনে সিঁড়ি থেকে নেমে গলি দিয়ে যেতে যেতে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের ভেতরে চলে গেল আন্না। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে মনে মনে সেই রোগা লোকটিকে বোঝার চেষ্টা করছে আন্না।

সে কি রকম লোক! তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ অর্থ-ব্যঞ্জক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কখনও তার চকচকে চোখে রাগের আভাষ, কখনও তা স্নেহ করুণায় আর্দ্র। কাছে এলে সে আপনভোলা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তার সিংহ বিক্রম!

'সে কি মৃত্যুপথে ঠেলে দেয়?' নিজেকেই প্রশ্ন করল আন্না। 'আর যদি তাই হয়, তবে?'

তার চোখে স্নেহময় কোমলতা কেন? বাবা মারা যাওয়ার পর দু'দাদার যখন জেল হল, তখন কেন সে এসে তাকে তার মার সংসার খরচের পয়সা রোজ জোগাত? মাকে খোঁজার জন্যই বা কেন অর্ধেক রাত কষ্ট করে ঘুরে বেড়িয়েছে? ঘর যখন জ্বালিয়ে দেওয়া হল, তখন সে একা কেনই বা চার-পাঁচটা লোকের সঙ্গে লড়েছিল? সেই অচল অবস্থার সময়ই বা কেন চাল আর তরকারী কিনে এনে দিয়েছিল? 'সে কি মরণের পথেই নিয়ে যায়?' আবার সেই প্রশ্ন করল নিজেকে!

হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন একটা সুখদায়ক ব্যথা! সে ঠিক জানে না যে সেটা কি। একটা যন্ত্রণা বটে, তবে সেটা খুব আনন্দের!

আন্নার মনে হল লোকটি আবার আসবে। সে উঠে দরজা খুলে উঠানে এসে দাঁড়ায়।

গলির অন্ধকারের ওদিকে একটা শব্দ।. আন্নার মনে হল যেন একটা মধুর ব্যথা তার শরীরের অণুপরমাণুতে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

পুলকের শিহরণ শরীরে।

'কি ভেতরে যাওনি তুমি?'—একটা আদেশের সুর ছিল কথাটায়।

রোগা লোকটি পাশে এসে দাঁড়াল। আবার প্রশ্ন করল-- 'ভেতরে যাওনি কেন?'

'গিয়েছিলাম ত! দরজা বন্ধও করেছিলাম'—ধীরস্বরে সে বলল।

'তাহলে?'

'তখন মনে হল বাইরে আসি'—কথাটা বলে আন্না মাথা নোয়াল।

একটা দীর্ঘ নীরবতা।

'আন্না।'

'হুঁ।'

'ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও।'

'আচ্ছা।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে লোকটি গলিতে পা বাড়াল। তারপর আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

আন্না ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

[20]

নিপীড়িত, শোষিত আর দাসত্বে নিমগ্ন জনগণের একদলের মধ্যে জাগরণের সূচনা দেখা দিচ্ছে। মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল তারা।

দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টায় হাতে-পায়ে চোট লাগার সম্ভাবনা অনিবার্য। সে সময়ে চিন্তা বা পুনর্বিবেচনার সময় মেলে না, এ এক কঠিন অবস্থা। জাগরণ বা উন্নয়নের প্রতিকূল সমস্ত কিছুই

ভেঙ্গেচুরে গুঁড়িয়ে যায়।

প্রতিদিনের মত সেদিনও সংহতশক্তি শহরের আশপাশ থেকে ঝর্ণা আর নদীর জলধারার মত শহরাভিমুখে বয়ে চলেছিল। যে ঝর্ণা গোড়ায় প্রায় নিঃশব্দ বা কলস্বনা ছিল, এখন আনন্দমুখর হয়ে সগর্জনে বয়ে যাচ্ছে। প্রতিজ্ঞা, সরোষ অট্টহাসি, স্বাধীনতা নিয়ে তর্ক—নির্ভীক প্রতিজ্ঞা হয়ে সেই মহাপ্রবাহ কারখানার ভেতরে এসে এদিক ওদিক, তাঁতযন্ত্রের এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে পড়ল। মালিক ক্ষুব্ধ হলেন। অনুগত সেবকেরা ভীত।

সারাদিন অসুস্থ ছিল আন্না। অপেক্ষা করে আছে অন্ধকারের, হয়তো সেই রোগা লোকটি, হয়তো তার নিজের ভাই আসবে। তখন সব খবর পাবে

বেলায়ুধনের মা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করে—

'কি বাছা, এভাবেই বসে থাকবি তুই ?'

'আর কি করব ?'

'চাল আছে ঘরে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কঞ্জি তৈরী করে একটু খেয়ে নে।'

আন্না কঞ্জি বানিয়ে খেল। সন্ধ্যায় আবার বেলায়ুধনের মা আসে—

'মা আমার, তুই একা এভাবে শুয়ে থাকিস না। আমার কাছে চলে আয়, নয়তো আমি চলে আসি এখানে।'

'ভগবান রয়েছেন। উনিই থাকবেন আমার সঙ্গে।'

'ভগবান সহায়, শুধু একথা বলে থাকলে তো······'

'তেমনি থাকছি তো বলতে বাধাটি কি ?'

'কেউ এসে যদি ঘরে ঢুকে পড়ে ?'

'কি হবে এলে ?'

'জোর করে যদি ধরে নিয়ে যায়।'

'আমায় কেন ধরবে? আমি কি কাউকে মেরেছি না কারুর পয়সা কড়ি ছিনিয়ে নিয়েছি?'

'বয়স্থা মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে…'

গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। দৃঢ়স্বরে বলল, 'কেউ যদি ধরে নিয়ে যায় তাহলে নিজেই বুঝবে সে কাকে ধরে এনেছে।'

এরপর বেলায়ুধনের মা আর কিছু বলল না। কেবল কনিচ্চ কোলেঙ্গরের ভগবতী (কালী)র নাম করে প্রার্থনা জানায়।

রাত হয়েছে। দশটা বেজে গেছে। সজোরে দরজা বন্ধ করে আন্না ভেতরে শুয়ে রইল। সে ঘুমায়নি।

উঠানে শব্দ। সে কান খাড়া করে রেখে শুনতে চেষ্টা করে। মনে হল কয়েকটা লোক উঠানে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। উঠে সে দাঁড়ায়। দরজার কাছে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করে ব্যাপারটা।

কজন লোক ঘরের চারদিকে ঘুরছিল। সে কিছু প্রশ্ন করতে চাইল। কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না।

'এই। ভেতরে কে?' আদেশের একটা কণ্ঠ! ঐ স্বর তার পরিচিত নয়।

'তুমি কে?' আন্না মৃদুস্বরে জানতে চাইল।

'দরজা খোল্!' তাতেও একটা আদেশ।

দেশলাই নিয়ে প্রদীপ জ্বালাল আন্না। তারপর প্রদীপ হাতে দরজা খুলে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। মূর্তিমান যমদূতের মত চারটি পুলিশ উঠানে দাঁড়িয়ে।

একটি লোক বারান্দায় উঠে এসে আন্নার হাত থেকে প্রদীপ ছিনিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। ঘরে সব খুঁজে পেতে ফিরে এসে গম্ভীর হয়ে আন্নাকে জিজ্ঞাসা করল—

'আরে, রোক্কি কোথায়?'

'ছোড়দা ত' এখানে নেই। আসেওনি এখানে।'

'তোকে জিজ্ঞাসা করছি সে কোথায় ?' চীৎকার করে পুলিশটি বলল।

'আমি তা কি করে জানব ?' অবিচলিত স্বর আন্নার।

'কি, তুই জানিস না'—নিষ্ঠুরের মত লোকটির মুখ।

'আমি জানি না।'

'সত্যি কথা বললেই ভালো হবে।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি।'

উঠানে দাঁড়ানো পুলিশরা বারান্দায় উঠে এল। তাদের একজন বলল—

'ভারী সুন্দর মেয়ে। একদম ভয় পায় না। আচ্ছা তোর নামটা কি ?'

'আন্না।'

নামটা তো সুন্দর'। সে হাত রাখল আন্নার কাঁধে।

আন্না হঠাৎ পিছিয়ে গেল।

'আমি এখানেই আছি'—গলি থেকে চেঁচিয়ে কে যেন বলল।

'কে রে তুই ?'—পুলিশেরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে।

'আমি—রোক্কি।'

'ধর ওকে'—সবাই একসঙ্গে গলিতে লাফিয়ে পড়ে।

'আমায় ধরতে পার ত ধরো'—গলির লোকটি বায়ুবেগে ছুটল। পুলিশেরা পেছনে পেছনে ছুটল।

'হায়, প্রভু!' আকাশের দিকে হাত জোড় করল আন্না। কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। খানিকটা সময় কেটে গেল।

'কি ব্যাপার, বোনটি ?'—

বলতে বলতে উৎকণ্ঠাভরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল রোক্কি। আন্নার বিশ্বাসই হচ্ছিল না এ রোক্কিই। কাছে আসার পরও সে জিজ্ঞাসা করে—'কে ওখানে ?'

'আমি, বোনটি! আমি!'

'ছোড়দা ?'

'হ্যাঁ।'

'কি, পুলিশ ধরতে পারেনি তোমায় ?'

'কোন পুলিশ ? যারা এসেছিল ? ওরা আমায় ধরতে এসেছিল কি ?'

'তবে কি কিছুই জানতে না তুমি ?'

'আমি জানব কি করে ? আমি ত এখুনি এলাম।'

'এ্যাঁ ?'

'আমি এখানে—এই বলে তোমার ছুটে যাবার শব্দ পেলাম।'

'তুই বোধহয় স্বপ্ন দেখছিস্।'

'তাহলে কে ওভাবে চীৎকার করে দৌড়ে পালাল ?'

'দূর পাগলী, হয়ত ওরকম তোর মনের ভুল।'

'আমার শুধু যদি ওরকম মনে হয় তাহলে পুলিশ পিছু নিয়েছিল কেন ?'

'কি, পুলিশ এসেছিল এখানে ?'

'রোঙ্কি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে করতে যখন পুলিশ এসে আমায় ধরল, তখনই গলি থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল।'

ভাবনায় পড়ল রোঙ্কি। আবার পরে বলল—

'তাহলে হয়তো বা হাওয়া।'

'হ্যাঁ, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। এখান থেকে পুলিশদের সরিয়ে নেবার জন্য এধরনের কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল।'

কিছুদূরে রাস্তার ধারে গাছপালার মাঝে একটা শব্দ শোনা গেল। আন্না ঘাবড়ে যায়,—'পুলিশ আসছে। এসে গেল। ছোড়দা চলে যাও।'

'আমি যাব কোথায় ? আসবে ওরা, আমায় ধরে নিয়ে যাবে।' রোগা লোকটি সিঁড়ির মাথায় উঠানে এসে দাঁড়াল। আন্না দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করল—

'একটু আগে গলির মুখে আপনি কথা বলছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'পুলিশ কোথায়?'

'ওদের ঘোল খাইয়ে দিয়েছি।' রোক্কির হাত ধরে প্রশ্ন করল—

'আমি বলিনি যে এখানে আসা ঠিক হবে না?'

'আমার ছোট বোনটি……'গলা ভারী হয়ে এলো রোক্কির।

'এসো এদিকে। ওর কোন বিপদ হবে না।' সে হাঁটতে শুরু করে। রোক্কিও সঙ্গে চলল।

গলিতে নেমে রোগা লোকটি আন্নাকে বলল—'ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও।'

'হায় প্রভু।' আস্তে আস্তে আকাশ পানে হাত ওঠাল আন্না।

[21]

গাছতলায়ও একটা গোলমালের গুঞ্জন উঠল। সর্বত্র ধর্মঘটের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে। পুঁজিপতি বা পুলিশের ধমকানিতেও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এ যেন প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে উজিয়ে যাওয়া। একসময় যা অসাধ্য ব'লে মনে হয়েছিল, এখন যেন তা সাধ্যায়ত্ত। এমন সন্দেহও জেগেছিল, হয়ত বা স্রোতের গতি বদলে যাবে। যারা স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে অভ্যস্ত তারাও উজিয়ে যাওয়া দলের দিকে স্পষ্ট সহানুভূতি দেখাতে লাগল। শ্রমিকের সংহতশক্তি এইভাবে বিনা আনুষ্ঠানিকে স্বীকৃতি পায়।

কমরেড নীলকণ্ঠন শ্রমিক সংগঠনের নেতা হলেন। যেহেতু তিনি উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চবংশজাত, তাই পুজিপতি আর সরকারী মহলের

পক্ষে তাঁর নেতৃত্বাধীন সংগঠনকে বেপরোয়া গালিগালাজ বা তিরস্কার করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। এখন বন্দী শ্রমিকদের জামিন জামানতের বা মামলার তদ্বিরের ব্যবস্থাও হল।

আন্না সর্বদা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যেন দাদারা তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। সেই রোগা লোকটি রোজ রাতে এসে টাকা-পয়সা আর চাল দিয়ে যেত। সে এলে নানা প্রশ্ন জাগে আন্নার মনে, কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারে না সে।

প্রতিদিনের মত সে রাত্তিরেও রোগা লোকটি উঠানে এসে বসল। প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল আন্না। লোকটি বারান্দায় একটা ঝাঁপি রাখল। তাতে রয়েছে চাল ও অন্যান্য জিনিস। সসঙ্কোচে আন্না জানতে চায়।

'কতদিন ধরে এরকম চালিয়ে যাবেন ?'

'আজ পর্যন্ত এর প্রয়োজন।'

'কেন ?'

'কাল ওরা আসবে।'

'আসছে ? কাল আসবে দাদারা ?' সানন্দে আন্নার প্রশ্ন।

'ওরা আসছে, তুজনেই।'

আন্নার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করে—

'আবার যদি ওদের ধরে নিয়ে যায়, তাহলে ?'

'আবার ধরলে আমি আবার আসব।'

'এভাবে দিনের পর দিন……'

'এভাবে ?'

'এলে ?'

'কি হয় এলে ?'

'কেন, আপনি কি আমাদের আপনজন ?'

'কেন, আমি কি আন্নার কেউ নই ?'

'হ্যাঁ'—সে মাথা নেড়ে সায় দিল।

'আন্না'—সে আবার কাছে এসে দাঁড়াল।

'হুঁ'—মুখ তুলে চাইল আন্না।

তারার আলোয় চারচোখের মিলন হল।

কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ্য। কিন্তু এ মুখর মৌন। লোকটি জিজ্ঞাসা করল—

'আমি তাহলে আসি?'

'দাদারা কাল কখন পৌঁছাবে?'

'কাল যে কোন সময় এসে যেতে পারে।'

'আসছেন কি ওদের সঙ্গে?'

'কে, আমি?'

'হ্যাঁ।'

'আসছি না।'

'পরে আসবেন তো?'

'না।'

খানিকটা নীরবতা। সেটা ভঙ্গ করে লোকটি ডাকল—

'আন্না?'

'হুঁ!'

'আসি তাহলে?'

জবাব মিলল না।

ঘুরে সে চলে গেল। সিঁড়ি অবধি গিয়ে ফিরে তাকাল। আন্না তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু একটা সে বলতে চায়। কিন্তু বলল না। গলিতে নেমে সে চলে গেল।

বন্দীদের জামানতের ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া হল। রোকিও জামিন পেয়েছিল। সন্ধ্যা নাগাদ সকলেই এরা যার যার ঘরে ফিরে আসে।

ভাত তরকারী রেঁধে আন্না দাদাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের দেখে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। রোকিও কেঁদে ফেলল।

এ্যান্টনী নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

'আন্না চালের জোগাড় করেছে?' এ্যান্টনী জিজ্ঞাসা করল।

'কোত্থেকে এল?'

'এটা? এটা তো…'

'হাওয়া দিয়ে গেছে? তাই না?' রোক্কি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'তোর এতদিন চলল কি করে?' এ্যান্টনী জানতে চাইল।

'উনিই এনে দিতেন। এভাবে ব্যবস্থা হয়ে যেত।'

'তা এখন সে গেল কোথায়?'

'গতকাল রাতে চাল ও জিনিসপত্র দেবার সময় বলে গিয়েছিলেন যে ভাইয়েরা আজ আসছে। তারপরেই চলে গেলেন।'

এ্যান্টনী আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। খাওয়া সেরে রোক্কি মাদুর বিছিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ল। আন্না ঘরের ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। এ্যান্টনী উঠানে পায়চারি করছে।

মাত্রায়ি আর সাইমন সন্ধ্যা পেরিয়ে বাড়ী পৌঁছাল। তাদের দরজা বন্ধ। বারান্দায় ঝাড়ু দেওয়া আছে। মাত্রায়ি জিজ্ঞাসা করল—'কে আবার বারান্দা ও তার ধারটা ঝাড়ু দিয়েছে?'

'দিলে আন্নাই হয়তো দিয়েছে, কিংবা বেলায়ুধনের মা।'

মাত্রায়ি বন্ধ দরজার দড়িটা টেনে খোলে। ঘরের ভিতরে মাটির পালি, ঘড়া, বাবার খাট-মাদুর সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। তবে অন্ধকারে সব কিছু ঠিকমত ঠাহর হচ্ছিল না।

বাবার জড় শরীর যেখানে শায়িত ছিল, সেখানে দুভাই-ই মাথা ঠেকাল। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। সব ভুলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাল যেন স্বর্গে তিনি তাঁকে সুখে রাখেন।

উঠানে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বড়ভাই ছোটজনকে ডেকে বলল—

'তুই পড়শীদের কাছ থেকে নারকেল পাতা চেয়ে এনে মশাল

জ্বেলে নিয়ে আয়।'

'দেশলাই আর প্রদীপ ভেতরেই আছে'—উঠানের অন্ধকারের ভেতর থেকে সেই রোগা লোকটি বলে উঠল।

'এ কে?'—দুভাই-ই একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'আমি।'

'হাওয়া নাকি?' মাত্রায়ি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'কি, রোজ আসতেন এখানে?'

'হ্যাঁ।'

মাত্রায়ি ঘরের ভেতরে গেল। হাওয়া ডেকে বলল—

'দেশলাই আর প্রদীপ খাটের ওপরে রয়েছে। তার পাশেই ঝাঁপিতে চাল ও অন্যান্য জিনিস আছে।'

দেশলাই জ্বালতেই ভেতরটা আলোকিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ নিয়ে মাত্রায়ি বাইরে আসে। উঠানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—

'কোথায়'?

গলি থেকে হাওয়া জবাব দিল—

'আবার আসব'খন।'

[22]

কিছু লোক আছে যারা লড়াইয়ের ময়দানে প্রচণ্ড তর্জন গর্জন করে, কিন্তু যখন একা, নিঃসঙ্গ তখন ডুকরে ডুকরে কাঁদে। আবার একদল রয়েছে, যারা বুকে ছুরি বসিয়ে রক্তধারা বইয়ে দিতেও পেছপা নয়, আবার অন্যের ব্যাধি-আরোগ্যের জন্য প্রাণ দিতে তারা

সদা প্রস্তুত। অদ্ভুত বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

স্নেহ আর দ্বেষকে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বলা হয়। কথাটা হয়ত বা ঠিক। কিংবা, স্নেহ আর দ্বেষের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন, সম্ভবত আজও কেউ টানতে পারেনি।

কিছু লোকের স্নেহের প্রকাশ অন্তর্মুখী। সেই স্নেহ তাদের ব্যক্তিত্বের সীমিত পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত। ব্যক্তিগত সুখ ও সমৃদ্ধির পথে যা কিছু বাধা সে ব্যাপারে এদের বিদ্বেষভাব। তাই অপছন্দের যাবতীয় কিছু শেষ করার জন্যে এরা ছলনা ও অন্যায়ের আশ্রয় নেয়।

আবার এমন লোক আছে যারা স্নেহের সীমা বিস্তৃততর করেছে। স্নেহাকাঙ্ক্ষী অথবা স্নেহলাভের যাদের সত্যিকারের অধিকার আছে, তাদের সবার জন্যই সে স্নেহ সদা বর্ষিত হয়। তাদের সেই স্নেহ-প্রীতির উদ্দেশ্যই হল পরিশ্রমীজনের বোঝা কমানো। এরা পীড়িতদের সহানুভূতি ও আশ্বাস দেয়, তাই স্বভাবতই পীড়নের প্রতি তাদের বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ কখনও কখনও হিংসা, অত্যাচার ও অযথা উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

খুব কমলোকই ভালো মন্দের উর্ধ্বে মনুষ্যত্বের বিচার করে। সবার মধ্যেই ভালো-মন্দ খুঁজে পায় এরা, প্রতিটি মানুষের শুভবুদ্ধি বা মন্দ দূর করবার জন্য এরা বিশেষ যত্নবান।

কিন্তু তারা ছলনা বা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। হ্যাঁ, এমন কি অন্যায়কে দূর করবার জন্য তারা নিজের প্রাণ উৎসর্গের জন্যও সদাপ্রস্তুত।

এ্যান্টনী এই ধরনের লোক। রোক্কি দ্বিতীয় দলের মানুষ। বাড়ীতে চড়াও হয়ে মিস্ত্রীকে ঘুষিমারা আর ছোট মালিককে পাথর মারা—রোক্কির এসব এ্যান্টনীর ভালো লাগেনি। আবার, হাওয়ার মত ঘুরে ফিরে শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি, আন্নাকে রোজ লুকিয়ে চাল আর পয়সা জোগানের কারণে সেই রোগা লোকটিকে

সে পছন্দ করে।

উঠানে পায়চারি করতে করতে সে বিড়বিড়: করছিল—'চালটা ঠিক হয়নি। এভাবে চললে……'

'বড়দা, বিড়বিড় করে কি বলছো?' রোক্কি মাদুরের ওপর উঠে বসল।

'আমি বলছি চালে ভুল হয়েছে।'

'কোন্ চালটাতে?'

'বাড়ীর ভেতর লোককে ধরে পেটানো কিংবা পথ চলা লোককে পাথর মারা।'

'তাহলে বল যে ঘর জ্বালানো কাজটা ঠিক? আমাদের পুলিশ এসে ধরল সেটা ঠিক হয়েছে?' রোক্কি উঠানে নেমে এল।

'এরকম এলোমেলো প্রশ্ন যদি করিস, তবে……'

'তাহলে আর কিভাবে করব?'

'ঘর জ্বালানোর প্রতিশোধ হিসাবে মিস্ত্রীকে ধরে পিটলে কি সেই আগুন নিভে যাবে?'

'আর আগুন দেখে, হাতে হাত মিলিয়ে বসলেই কি সেই আগুন নিভবে নাকি?'

'উল্টোপাল্টা কথা বলিস না রোক্কি।'

'তা তুমি কি বলছো?'

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল আন্না। রোক্কিকে তাই জিজ্ঞাসা করে—

'ছোড়দা মিস্ত্রীকে মারধোর করেছিল বলেই ত পুলিশ বড়দাকে ধরে নিয়ে গেল, তাই না?'

'ও……ত, ও' রোক্কির মুখে উত্তর জোগাল না। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

'আন্নাকে এ্যাণ্টনী ধমক দিল—

'তুই চুপ কর্! আমরা কথা বলছি। তুই গিয়ে শুয়ে পড়্।'

'আমিও ত তাই বলছি।'

'তুই শুয়ে পড়্ গিয়ে।'

আন্না ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। এ্যাণ্টনী রোক্কিকে প্রশ্ন করে—

'ছোট মালিককে পাথর ছুঁড়ে কে মেরেছিল?'

'ও……ও তো……'

'আমি জানতে চাইছি তুই ছুঁড়েছিলি কিনা?'

'না।'

'তাহলে কে?'

'হাওয়া বোধহয়, তার সঙ্গেও যেন কে একজন ছিল।'

'সে ত' মারামারি আর মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়ার লোক।'

'তবে সে যদি না হয়, তাহলে…… ?'

'না হলে কি?'

'তাহলে আমাদের বোনের কাছে পুলিশ এসে……'

'সবটা বল।'

'ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে নে।'

'আন্না আয় এদিকে।'

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল আন্না। এ্যাণ্টনী জিজ্ঞাসা করে—

'পুলিশ এসেছিল এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'দিনে না রাতে?'

'তাহলে?'

'তাহলে একটা পুলিশ ত' আমায় ধরতে এসেছিল।'

'কি, ধরেছিল?'

'না, গ্রেপ্তার করতে পারেনি। একটা পুলিশ জিজ্ঞাসা করছিল রোক্কি কোথায় গেছে। যখন বললাম এখানে নেই, তখন সে

আমায় ধরতে এল। সে সময়ে গলি থেকে ডেকে কে যেন বলল যে 'আমি এখানে', বলেই সে ছুটতে শুরু করল। পেছনে পুলিশও দৌড়াল।'

'একথা বলে কে ছুট দিল? হাওয়া কি?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। এবারে তুই গিয়ে ঘুমো।'

আন্না ভেতরে গিয়ে দুয়ারে খিল দিল। এ্যাণ্টনী পায়চারি করতে থাকে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। তখনও পায়চারি করছে এ্যাণ্টনী। প্রতিবেশী সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রোক্কির নাকের ডাক মাঝরাতের নীরবতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে।

ঘরের দরজা খুলে আন্না বেরিয়ে এসে এ্যাণ্টনীকে জিজ্ঞাসা করল—

'বড়দা তুমি ঘুমোবে না?'

বুকের ওপর আড়াআড়ি করে হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আন্নার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্ন করল—

'কি, রোজই সে এখানে আসত?'

'কে, হাওয়া?'

'হ্যাঁ।'

'গতকাল রাতে এসে একবোঝা চাল আর কিছু জিনিসপত্র রেখে চলে গেছে। এ পর্যন্ত আর তার দেখা নেই।'

'সে কি তোর সঙ্গে কথাবার্তা বলত?'

'কখনও আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিত। নয়ত চাল আর পয়সা রেখেই চলে যেত।'

এ্যাণ্টনী আর কিছু জানতে চাইল না। আন্না জিজ্ঞাসা করল—

'কেন তুমি ওর কথা জিজ্ঞাসা করলে? ওরা······?'

'এমনি জানতে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার

গিয়ে তুই শুয়ে পড়্……'

আন্না ভেতরে চলে গেল। এ্যান্টনী আবার পায়চারি করতে থাকে।

[23]

শান্ত হ'ল আন্দোলনের পটভূমি। তবে সে শান্তি যেন আর এক দীর্ঘস্থায়ী, শক্তিশালী আন্দোলনের প্রস্তুতিরই অগ্রদূত।

শ্রমিক সংগঠন লৌহদুর্গের মত দুর্ভেদ্য এবং মজবুত আকার নিতে শুরু করেছে। কারখানা শত্রুঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল এবং সেটা আক্রমণের জন্যই যেন সৈন্যদল প্রস্তুত হয়ে রইল। শ্রমিক স্বার্থের প্রতিকূল এক একটি কথা, দৃষ্টি বা ভাবের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করা হ'ল। পুঁজিপতি আর মালিকরা আক্রমণের কেন্দ্র থেকে পিছু হটে আত্মরক্ষার জায়গা খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

শ্রমিকদের মধ্যেও আক্রমণের কারণ ও দাবীর ব্যাপারে পরিবর্তন দেখা গেল। আগে তাদের দাবী ছিল যেন মজুরী না কমে, মালিকের খুশীমত ছাটাই যেন না হয়, মারপিট জুলুম আর মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করার চেষ্টা চলবে না। এখন দাবী দাওয়া বদলে গেছে। এখন তাদের দাবী মজুরীবৃদ্ধি, কাজের সুযোগের বিস্তার, নির্দিষ্ট ধারায় কাজ আর শ্রমিকের প্রতি ন্যায় ব্যবহার। এইসব দাবী বা লক্ষ্য ছাড়াও শ্রমিকদের আপাতত আরেকটা উদ্দেশ্যের হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল। বর্তমানে শেষ দাবী যে এমন সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজন যেখানে উঁচুনীচু বলে কোন ভেদ থাকবে না, নিপীড়ন শোষণ চলবে না আর সমস্ত ব্যবস্থার ভিত্তি

থাকবে সমতা ও সমৃদ্ধি।

মজুরীবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধির আন্দোলন আপাতত এই অন্তিম লক্ষ্যের আন্দোলনের একটা অঙ্গ বা সোপান হয়ে উঠল।

এ্যাণ্টনী, মাত্রায়ি, অচ্যুতন, পদ্মনাভন, জোসেফ প্রভৃতিরা শ্রমিক-নেতা ও সংগঠনের প্রতিপত্তিশালী কর্মকর্তা হ'ল।

বিরাট সভা, আলোচনাচক্র, গুপ্তসভা! ভাষণ, ভাষণ আর ভাষণ! দাসত্ব আর দুর্দশার গভীর অন্তর্দেশ থেকে কে জানে কি একটা মন্ত্রশক্তির ফলে শ্রমিকদল ওপরে উঠে আসছিল। এ যে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বলতার দিকে ধাবমান এক প্রবাহ, দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধির দিকে জয়যাত্রা। বিশ্বইতিহাসে এশতকের এক গুরুত্বপূর্ণ নতুন অধ্যায় যেন রচিত হচ্ছিল। আলপ্পুষা সহরের শ্রমিকবর্গ সেই নতুন ঐতিহাসিক নাটকের কয়েকটি অভিনেতা মাত্র।

'হাওয়া' নামের সেই রোগা লোকটির কণ্ঠস্বর ক্রমেই উঁচু হচ্ছিল। চায়ের দোকানে, চৌরাস্তার মোড়ে, আলোচনা সভায়, গুপ্ত সমিতিতে —সর্বত্র তার কথার প্রতিধ্বনি উঠছিল। প্রতিটি শ্রমিকের কণ্ঠে হাওয়ার হুঙ্কার অনুরণিত।

'শৃঙ্খল ছাড়া আমাদের হারানোর কিছু নেই। আর পাওনা আমাদের সারা বিশ্বসংসারই।'

একমাত্র এ্যাণ্টনীর কথা বা বক্তব্য যেন হাওয়ার হুঙ্কারের চেয়ে একটু আলাদা। সে তার একান্ত নিজস্ব বক্তব্য। গুরুগম্ভীর স্বরের আর দুঃখবিহ্বল সেকথা। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উদ্ভূত সে বক্তব্য নিজের গ্রাম্যধরনের শ্রমিকের কণ্ঠের দুঃখকথা রাঙিয়ে রসিয়ে এ্যাণ্টনী সমুদ্রের মত ব্যাপ্ত জনতাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করত—

'আমি জিজ্ঞাসা করছি, আমরা কি মানুষ? আর যদি তাই হয় তবে……'কথাটা শেষ না করেই সে বলত—

'তিলে তিলে মরার চাইতে একসঙ্গে আমরা সব শেষ হয়ে যাই।' সভার এককোণে বসা রোক্কি বিড়বিড় করে বলে উঠত—

'মরব কেন? মরার চেয়ে মারা ভালো।'

এসব হাওয়ার কথার প্রতিধ্বনি।

এ্যাণ্টনীর বাড়ী গুপ্তসভার কেন্দ্র হ'য়ে উঠল। সন্ধ্যার পর থেকে মাঝরাত অবধি সেই ঘরে আলো দেখা যেত, সঙ্গে চাপা স্বরে কথাবার্তা। মাত্রায়ি, সাইমন, পদ্মনাভন, অচ্যুতন, শঙ্কু, জোসেফ, এ্যাণ্টনী, রোক্কি—সবাই সে গুপ্তসভার অংশীদার। সেই রোগা লোকটির গম্ভীর কণ্ঠও শোনা যেত সেখানে।

সবাইকার জন্য ব্ল্যাককফির ব্যবস্থা, বিড়ি আর পানের জোগান, তেল শেষ হলে প্রদীপে আবার তেল ভরে দেওয়া—ইত্যাকার যাবতীয় কাজ আন্নার।

সেই গুপ্তসভায় আরও দু-তিনজন নতুন লোক আসতে শুরু করল। আন্না তাদের চিনত না। তাদের দেখেনি কখনো আগে। পরনের কাপড় আধময়লা হলেও, চটপট কথাবার্তা বলার ধরন থেকে বোঝা যায় তারা সাধারণ শ্রমিক নয়। তাদের মধ্যে সুন্দর চেহারার একব্যক্তি গুপ্তসভাকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। নিজের মার্জিত, সুস্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন ভাষায় শ্রমিকদের শেষ লক্ষ্যের কথাও তিনি বলতেন। কার্লমার্কস, লেনিন আর রুশ বিপ্লব সম্পর্কেও দীর্ঘ ভাষণ দিতেন।

রাশিয়ায় লেনিন কিভাবে বিপ্লবের সৃষ্টি করলেন, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে চরম বিপ্লবের জন্য কি করে শ্রমিকদের শক্তি সংগ্রহ করতে হবে এবং মজুরীবৃদ্ধি ও কাজের সুবিধাবৃদ্ধির আন্দোলনকে সামগ্রিক রাষ্ট্রবিপ্লবে রূপান্তরিত করা সম্ভব—এসব কথা সেই যুবকটি বলতেন। তার এক একটি কথা, চাহনি আর স্পন্দনে বিপ্লবের অগ্নিজ্বালার দহন ছিল। নাটকীয়ভাবে তিনি বলে উঠতেন—

'হত্যায় আমাদের লিপ্ত হতে হবে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে হবে,

সে রক্তধারা ঠেলে এগুতে হবে। সখ্যস্থাপনে, সৌভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক প্রীতি-সৌহার্দ্যের জন্য এসবই প্রয়োজন।'

'সে কি রকম' অজ্ঞাতে এ্যাণ্টনী জিজ্ঞাসা করে ফেলত। মুখে তার কথার তোড় ছুটত—

'মারধোর আবার ভালবাসায় পোঁছায় কি করে? মার দিয়ে সাম্যস্থাপন কি করে সম্ভব?' —মাঝপথে রোক্কি বলে ওঠে।

'এটা কি ভাবে হয়? —তার জবাব আছে। তার অর্থ ভালবাসার লোককে মারাও প্রয়োজন। সে কথাই তারা বলছে।'

'মারার পরে আবার...... ?'

'মারার পরেই ত আমাদের শাসন কায়েম হবে।'

'আমি জানতে চাইছি, মারধোর ছাড়া, রক্তপাত না ঘটিয়ে, সেটা কি সম্ভব নয়?'

পদ্মনাভন তার জবাব দেয়—

'সম্ভব নয়, কারণ...... ।'

অসহিষ্ণু হয়ে রোক্কি বলে ওঠে—

'বড়দা বলতে চাইছে যে, যে সাপ ফণা তুলে আসছে, তাকেও চুমু দাও।'

এ্যাণ্টনী আর কিছু বলত না।

[24]

এখন আন্না পুরো খুশী। তার দাদারা আপাতত জেলে বা কোন গুপ্তআড্ডায় থাকত না। তারা রোজই বাড়ী আসত, সংসারের খরচ চালাতো এবং রাতে বাড়ী থাকত—এ সবের জন্য সে খুব

খুশী ছিল। তার খুশীর বড় কারণ যে, সে এখন নির্ভয়ে বাড়ীতে থাকতে পারে।

এখন রোজই সে মরিয়মের ছবির সামনে বসে মা-বাবার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা জানায়। মেরীমাতার কাছে আপদবিপদ থেকে দুই দাদাকে রক্ষা করবার জন্যও সে প্রার্থনা জানাত।

এ্যান্টনী ও রোকি কি করে তা নিয়ে সে মাথা ঘামাত না। সেরকম কোন চিন্তা পছন্দই করে না সে। তাদের পরস্পরের মধ্যে স্নেহপ্রীতির সম্পর্কটা বজায় থাকুক এটুকুই কেবল তার কাম্য। যেসব ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলো স্মরণ করে সে প্রার্থনা করত—

'হে সর্বগুণান্বিতা মরিয়ম. আমার দাদাদের বিপদ থেকে তুমি রক্ষা কর।'

রাতের গুপ্তসভা সমাপ্ত হলে এ্যান্টনী আর রোকিকে খেতে দিয়ে নিজে খেত। এ্যান্টনী আর রোকি বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। সে শোয় ভেতরে। কখনও কখনও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গুপ্তসভার কথাবার্তাও শোনে। তবে সব কিছু বুঝতে পারে না। তবু সেই রোগা লোকটির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত। সেই-ত তার মা-বাবাকে টাকা-পয়সা দিত, চাল আর জিনিসপত্র জোগাত, তার নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়েছে আর কৌশলে পুলিশী জুলুম থেকে বাঁচিয়ে সতীত্বহানির হাত থেকে রক্ষা করেছে। সেই লোকটির মুখনিঃসৃত অনর্গল শব্দধারার অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করত। কিন্তু কিছুই তার বোধগম্য হয় না, মনে হয় অন্য এক ভাষায় কথা হচ্ছে। তবু তাকে দেখতে বসে থাকত সে। তার কথা শুনেই আনন্দ।

একদিন রাত্তিরে রান্নাঘরে আন্না ব্ল্যাককফি তৈরী করছিল, বাইরের ঘরে সেই বিপ্লবী সুদর্শন যুবকটি কথা বলছে। বক্তব্য শেষ হলে সারাংশটুকু আবার সে আওড়াল—

'মারতে হবে, রক্ত ঝরাতে হবে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে হবে।'

আন্না চমকে উঠল। এধরনের কথা সে প্রথম শুনল। ওখান থেকে উঠে গেল সে। আবার দরজার আড়াল থেকে সেই বিপ্লবী যুবকটির মুখের দিকে দেখল—তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। রোগা লোকটির দিকেও আবার দেখল—চোখ বুঁজে কি একটা চিন্তায় সে মগ্ন। রোক্কির দিকে পরে তাকাল—কটকটে চোখে দাঁতে দাঁত দিয়ে সে বসেছিল। ভয় পেল আন্না। সবারই মুখে চোখে একটা ক্রূরতার ছাপ। কেবল এ্যান্টনীই মাথা নীচু করে ফরাসের ওপর কিছু লিখছিল।

সভায় কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা। হঠাৎ মাথা তুলে এ্যান্টনী জিজ্ঞাসা করল—

'কি, মারতে হবে?'

পদ্মনাভন জবাব দিল—

'কথাটা বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রয়োজন হলে মারপিটও করতে হবে।'

'প্রয়োজন হবে কেন?'

'প্রয়োজন?......এমন যদি অবস্থা দাঁড়ায় যে মারামারি ছাড়া কাজ হচ্ছে না, তখন মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়তে হবে।'

'আমি জানতে চাইছি যে মারব কেন?'

'কি, এখনও কোন আলোচনা শোননি?'

'শুনেছি, তাই ত জিজ্ঞাসা করছি। তবে মারব কাকে?'

অসহিষ্ণুভাবে উঠে দাঁড়াল রোক্কি। এ্যান্টনীর দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে সজোরে বলল—

'এ ধরনের প্রশ্ন যে করে সে লোককেই মারা দরকার।'

স্তব্ধ হল সভাস্থল। দরজার কাছে দাঁড়ানো আন্না তাড়াতাড়ি বাইরে আসে। ভূতাবিষ্টের মত কাঁপতে কাঁপতে সে রোক্কিকে জিজ্ঞাসা করে—

'কাকে?......কাকে মারবে? বলো ছোড়দা কাকে মারবে?'

মাথা নুয়ে এল রোক্কির। এ্যাণ্টনী উঠে আন্নার কাছে আসে, শান্তভাবে সস্নেহে বলে—

'এই, তুই ভেতরে যা। ও মজা করছে।'

আন্নার চোখ অনুভূতিহীন। ভরাগলায় প্রশ্ন করে—'লোককে মারতে আর মেরে ফেলতেই কি তোমরা এখানে জড়ো হও?' এ্যাণ্টনী ধমক দিল আন্নাকে—

'তুই এখানে এলি কেন? তোকে কেউ ডেকেছে? যা ভিতরে যা।' আন্না রান্নাঘরে চলে গেল। সভায় সাড়াশব্দ নেই, সব নিস্তব্ধ। হাঁটুতে মাথা রেখে রোক্কি বসে। আস্তে আস্তে রোগা লোকটি উঠল। শান্তকণ্ঠে বলল—

'বন্ধুরা সব, এবারে চলি। এরপর সভা আর এখানে হবে না।' সে এগোল। পেছনে গেল অন্য সবাই। উঠানে নেমে বুকে আড়াআড়িভাবে হাত রেখে এ্যাণ্টনী পায়চারি করতে লাগল।

মধ্যরাত। বারান্দায় চিৎ হয়ে শুয়েছিল রোক্কি। এ্যাণ্টনী তখনও পায়চারি করছে। মাটির প্রদীপ হাতে আন্না উঠানে নেমে এল। আস্তে আস্তে এ্যাণ্টনীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

'বড়দা!'

'হুঁ?'

'কঞ্জি খাবে না?'

'তুই খেয়েছিস?'

'না।'

'ওকে ডেকে কঞ্জি খাওয়া। তুইও খেয়ে নে।'

'আর তুমি?'

'আমার খিদে নেই।'

'কেন খিদে নেই?'

'বোনটি, এসব তুই জিগ্যেস করিস না। ওকে ডেকে কঞ্জি খাওয়া আর নিজেও খা, ব্যস্।'

'বড়দা, আমি যা বলেছি তা কি ঠিক নয়, ভুল ?'

আন্নার গলা বুঁজে এল। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে—

'আর যদি ভুলই হয় তবে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে আমি রাজী।'

এ্যাণ্টনী তার কাঁধে হাত রেখে সাহস দিয়ে বলে—

'তুই কিছু ভুল বসিসনি। যা কথা হচ্ছিল, তাই বলেছিস!'

'আমি নিজেই ভুল বলেছি'—বলতে বলতে রোক্কি উঠানে নেমে এসে দাঁড়াল। এ্যাণ্টনীর সামনে গড় হয়ে ধরা গলায় বলল—

'আমিই বলে ফেলেছিলাম যে, আমার ভাইকেই মারা উচিত। ভুলটা আমার মুখ থেকেই বেরিয়েছে। বড়দা, ক্ষমা কর আমায়।'

'ওঠ্, ওঠ্ ভাই, ওঠ্'—এ্যাণ্টনীর গলাও ধরে এল।

'হায় প্রভু!' আন্না আকাশ পানে তাকায়।

[25]

কেরালার কোল্লাবর্ধম গ্রামের কন্যামাস সেটা (১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘের ঘনঘটা ছড়িয়ে পড়েছে তখন। স্বাধীনতা সংগ্রামের তপ্ত কটাহে ভারতবর্ষ তখন জ্বলছে। ইংরেজ শাসিত ভারত এবং দেশীয় রাজ্য জুড়ে এই আন্দোলনের বিস্তার। ত্রিবাঙ্কুরে যে ঝড় উঠেছিল আলপ্পুষা সেই ঝড়ের প্রাণকেন্দ্র। শ্রমিকেরা সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিল।

সেদিন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার জন্মদিন। সেটা সে রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব এবং পুণ্যতিথি বলে মানা হত। সেই দিনে কুটির থেকে প্রাসাদ আর বিদ্যালয় এবং দেবালয়ে মহারাজার জয়গাথা উচ্চারিত হত। কিন্তু সে বছর বর্ষপূর্তিতে পুণ্যতিথি

উদ্‌যাপিত হয়নি আর মহারাজার জয়গানও গায়নি কেউ। বরং জনসাধারণ সেদিনটা প্রতিরোধ দিবস এবং শোকদিবস হিসাবে পালন করল।

মহারাজার প্রতিনিধি হিসাবে শাসন অধিকর্তা যে দেওয়ান ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে সেদিন শ্রমিকেরা সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে। কারখানার চিমনী থেকে আর ধোঁয়া বেরোল না সেদিন। শহরের চারধার থেকে যে জনস্রোত প্রবাহিত হল তা সৃষ্টিশীল নয় বরং প্রলয়ঙ্কর শক্তির প্রকাশ বলা যেতে পারে। গলিতে বড় রাস্তায় শ্রমিকেরা মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে মহারাজা ও তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানাল।

কিন্তু স্বাধীনতাকামী এই প্রবাহ রোধ এবং ধূলিসাৎ করার উদ্দেশ্যে মালিকপক্ষ হিংসাদ্বেষ জাগানো বিধির উপকরণ জড়ো করে রেখেছিল। পুলিশের গাড়ি সহরময় টহল দিচ্ছে। গলিতে গলিতে লাঠি হাতে পাহারায় ওরা দাঁড়িয়ে। শ্রমিকেরা সেই লাঠি বন্দুককে ধিক্কার জানিয়ে থেকে থেকে মুঠি পাকানো হাত উঁচিয়ে গর্জন করে উঠছে।

সেই রোগা লোকটি সর্বত্র বিদ্যুতের মত উদয় হচ্ছিল। একবার চকিত চমকে হাজির হয়ে আবার অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ছে। আবার চমক, আবার অদৃশ্য এভাবে কখনও আড়ালে কখনও সামনে এসে সে ঝড়ের তেজকে জোরদার করে যাচ্ছে। শত্রুমিত্র সবাই তার চমকে গমকে অবাক।

একা বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল আন্না। সারাদিন তার খাওয়া-দাওয়া নেই। ঘুমায়নি সে। সারাটি রাত প্রদীপ জ্বালিয়ে দাদাদের অপেক্ষায় রয়েছে। ঘরে খাবারও নেই। অভুক্ত আন্না পথের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বেলায়ুধনের মা এবং অন্যান্য প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে কিছু কিছু কথা শুনছিল। তবে প্রশাসনের কিছুই সে জানে না,

তাই সেসব কথার অর্থও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বুঝতে চায়ওনি সে। তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা দাদারা রোজ যেন বাড়ী ফেরে আর তাদের বিপদ আপদ কিছু না ঘটে।

তিনদিন ধরে প্রদীপ জ্বেলে এভাবে সে অপেক্ষা করেছে। হঠাৎ দেখে সেই রোগা লোকটি বেড়ার ওধার থেকে তাকে লক্ষ্য করছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় ও। লোকটি তার আগেই আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেল। পরের রাতে লোকটি আবার এল। আন্না তাকে জিজ্ঞাসা করে—

'আমার বড়দা, আর ছোড়দা কোথায় ?'

'আসবে'—এইটুকু বলেই সে উধাও।

ভোরে ফটক খুলে সিঁড়ি বেয়ে এসে দাঁড়াল এ্যাণ্টনী। চমকে উঠে আন্না জিজ্ঞাসা করে—'তোমাদের পথের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ আমার কানা হবার জোগাড়। ছোড়দা কোথায় ?'

'কেন, আসেনি সে এখানে ?'

'না তো।'

'আমি তো বলেছি ওকে, ওর এখানে থাকা দরকার।'

'তাহলে এল না কেন ?'

এ্যাণ্টনী চিন্তিত। আন্না জিজ্ঞাসা করে—

'বড়দা, কি ভাবছ ?'

'ভাবছি······ভাবছি এই যে······'

'বড়দা তোমরা আসছিলে না কেন ?'

'আসিনি······কারণ যে······'

'বড়দা কথা শেষ করছ না কেন ?'

'শেষ করতে পারছি না এ কারণে······শেষ করতে পারছি······' কথা শেষ না করেই চলে যেতে যেতে বলল—'এই, এখুনি আসছি আমি।' 'একটু আলো ফুটতে না ফুটতেই আবার তুমি চললে কোথায় ?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি, চট্ করে ফিরে আসব।'

এমনভাবে সে গলি দিয়ে গেল যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে হেঁটে চলছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আন্না। গলিতে গলার আওয়াজ শুনে সে তাকাল।

'কে এখানে?'

'আমি।'

'রোক্কি—ছোড়দা? তুমি ছিলে কোথায়?'

'আমি......আমি ত......'

'আমি কি বলিনি তোমায় যে তোমার পক্ষে তার সঙ্গটা খুব সুবিধের হবে না?'

'সুবিধে হবে না কেন?'

'মারামারি আমাদের শোভা পায় না। ও শুধু মারধোর আর কাটাকাটি চায়। তাই সঙ্গ আমাদের মানায় না।......'

'আমার কাজ আমি বুঝব'—দৃঢ়স্বরে রোক্কি বলল।

গলির মুখে ছুটল আন্না। সে জিজ্ঞাসা করল—

'ছোড়দা, এ ধরনের কথা কেন বললে?'

এ্যাণ্টনী আন্নাকে ধমকে দিল।

'তুই যা। তুই বাড়ী যা।'

মাথা হেঁট করে এ্যাণ্টনী হাঁটতে লাগল। অন্যদিকে চলল রোক্কি। আন্না দীর্ঘশ্বাস নেয়। বাড়ী চলে এল সে।

উঠানেই দাঁড়িয়ে রইল আন্না। ক'দিন থেকেই সে লক্ষ্য করছিল যে রোক্কি এ্যাণ্টনীর সঙ্গে রুখে কথা বলে। এটুকু বুঝেছে যে সেই রোগা লোকটির কাছ থেকে রোক্কিকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছে এ্যাণ্টনী। তবে সে বুঝতে পারত না যে সেই রোগা লোকটিকে 'মারপিট আর মরণের দিকে ঠেলে দেবার লোক' কেন বলা হয়। সে নিজে খুব ভালোই বুঝছিল যে এলোক

সত্যিকারের কষ্ট সইতে, লোককে রক্ষা করতে পারে।

'কি, এসেছে?'

কথা শুনে ফিরে তাকাল আন্না। গলি থেকে সেই রোগা লোকটি ডেকে জিজ্ঞাসা করছিল। আন্না জবাব দিল—

'হ্যাঁ এসেছিল।'

'তাহলে?' লোকটি উঠানে চলে এল।

'তারপর চলেও গেছে।'

চুপচাপ লোকটি দাঁড়িয়ে রইল। আন্না বলল—

'সবাই বলাবলি করছে যে মারদাঙ্গা, খুনখারাপি হতে চলেছে।'

'কে? আমি করছি?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কি তা সত্যি মনে হয়?'—আরও একটু কাছে সরে এল সে।

'না।'

'কথাটা ঠিকই। মারামারি খুনোখুনিতে আমি পেছপা নই—' কথাটা যেন ঘা দিল এসে।

চমকে উঠল আন্না। বলল—'সব মিথ্যে, না?'

'তবে'—দৃপ্তকণ্ঠে লোকটি বলল—'শুধু মারদাঙ্গাই নয় আমি ভালবাসতেও জানি।'

আন্নার দিকে সে হাত বাড়াল।

আন্না হাতটা ধরে। তার হাত কাঁপছিল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অন্যদিনের থেকে আরো উগ্রভাবে সমুদ্র গর্জাচ্ছিল। প্রতিটি রাস্তাই যেন সমুদ্রবেলায় পৌঁছবার পথ। শ্রমিকের সংগঠিত শক্তিই প্রকাশ পাচ্ছে। বেলাভূমিতে এক উদ্বেলিত জনসমুদ্র। সত্যিকারের সমুদ্র থেকেও একে বড় ও গম্ভীর মনে হচ্ছিল।

উঠানে দাঁড়িয়ে আন্না। সে জানত আজ একটা কিছু ঘটতে চলেছে। বুঝতে পারছিল যে ব্যাপারটার পেছনে তার দুই দাদাও রয়েছে। সেই রোগা লোকটি? কেবল তার কথাই সে জানে না।

গলি থেকে বেলায়ুধনের মা জিজ্ঞাসা করল—

'ও মেয়ে, সমুদ্রতীরের দিকে আসছিস ত তুই?'

'হ্যাঁ, আসছি'—তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে সে গলির দিকে দৌড়াল।

খুব জোরে যাচ্ছিল আন্না। বেলায়ুধনের মা বলল—

'পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে ঘুরছে পুলিশ!'

'ওরা কেন এভাবে ঘুরছে?'

'ওরা বলছে হয়ত দাঙ্গাহাঙ্গামা হবে।'

'দাঙ্গা বাধাবে কারা?'

'শ্রমিকেরা!'

'কেন?'

'আমরা বলছি যে শাসনভার আমাদের হাতে থাকা দরকার।'

'তবে লোকেরা কি মেনে নেবে ব্যাপারটা?'

'মোটেই না। আর তাই ত ঝগড়া-বিবাদ।'

অন্ধকার হয়ে আসছে। তারা তুজনে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলেছে। চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো একজন পুলিশ আন্নাকে জিজ্ঞাসা করে—'তুই রোক্কির বোন না?'

আন্না জবাব দিল না। পুলিশটা আড়চোখে আন্নার দিকে তাকাল। সে চমকে উঠল। ক'দিন আগে তাকে ধরতে এসেছিল যে পুলিশটা, এ সেই।. তাকে আর একটি পুলিশ জিজ্ঞাসা করল—

'কি চেনাশোনা নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ভালোই? গোলমেলে নয়তো?'

'পরোয়া করি না।'

আন্নার হাত ধরে বেলায়ুধনের মা তাড়াতাড়ি এগোচ্ছিল। পুলিশটা তখন সঙ্গীকে বলছিল—

'চল পেছনে। ধরে ফেলব।'

বেলায়ুধনের মা আন্নাকে জিজ্ঞাসা করে—

'কিরে মেয়ে, চিনিস ওকে?'

'হ্যাঁ, একদিন রাত্তিরে এসে আমাদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল।'

'করেছিল গ্রেপ্তার?'

'না, ধরতে পারেনি। সেদিন হাওয়া আমায় বাঁচিয়েছিল।'

'এসব গোলমাল ত হাওয়াই করছে। আমার ছেলেকে ত ওই মারিয়েছে।'

'এঁ্যা!'

আচমকা একটা বিকট আওয়াজ হল। সমুদ্র যেন এসে তটভূমিতে আছড়ে পড়ছে। সিংহ, বাঘ, হাতী সব মিলে যেন তর্জনগর্জন করছে।

কান্না-আর্তনাদ—মৃত্যুরই হাঁকডাক !

কে জানে কত কি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে !

প্রচণ্ড গর্জন ! ভয়ঙ্কর আওয়াজ।

আন্নার হাতটা চেপে ধরে রাস্তার একপাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বেলায়ুধনের মা। আন্না পাগলের মতো অনর্গল কথা বলে চলেছে', 'আমার দাদারা !···তাদেরও কি মারছে ? মেরে ফেলল তাদের ?'

হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল সে। আরও জোরে হাতটা ধরে বেলায়ুধনের মা অনুনয় করে বলল—

'যাস্ না বাছা, যাস্ না।'

সামনে অনেক লোকজন আসছে। বেলায়ুধনের মা আন্নাকে রাস্তার একপাশে টেনে নিয়ে আসে।

জনাবিশেক লোক মৃত্যুভয়ে পালাচ্ছে ! তাদের মধ্যে একজন রাস্তায় পড়ে গেল। অন্যেরা ওঠাতে ওঠাতে দৌড়াল।

'রক্ত······রক্ত পড়ছে ! দেখলে !' আন্না প্রশ্ন করল।

'চুপ কর্ ! আমার সঙ্গে আয়।'

খুব জোরে চলতে লাগল ওরা দুজন। কাঠের পুল ধরে নালা পেরিয়ে গেল।

'দুম্ ! দুম্ ! দুম্ !'—আকাশে প্রতিধ্বনি ভেসে আসছিল। 'সিপাইয়েরা ছুঁড়ছে'—বেলায়ুধনের মা বলে। 'মারছে, মেরে ফেলছে সবাইকে'—আন্না সায় দিল।

'আয়'—বেলায়ুধনের মা আন্নার হাত চেপে ধরে দৌড়াচ্ছে। আকাশে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল।

* * * *

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আতঙ্কজনক এক নৈঃশব্দ্যে ডুবে গেছে সারা সহর, সেনাবাহিনীর গাড়ীর দ্রুত যাতায়াত, হর্নের আওয়াজ ভেঙ্গে দিচ্ছিল সেই নীরবতা। উঠানে একা দাঁড়িয়েছিল আন্না। তার

মনে হল যেন গলি দিয়ে কেউ আসছে। কান পেতে খেয়াল করার চেষ্টা করল। প্রশ্ন করল—

'ওখানে কে?'

'আমি।'

রোক্কি এসে উঠানে দাঁড়ায়।

'বড়দা কোথায়?'

'এঁ্যা?'

'বড়দাকে দেখোনি?'

'না'—কোমর থেকে দেশলাই বাক্স বের করে আবার বলল—

'আরও তুতিনটা দেশলাই নিয়ে আয়।'

'এখন দেশলাইয়ের কি দরকার?'

'বিড়ি ধরাব।'

'ছোড়দা, আজ কি খাওয়াদাওয়া নেই?'

'আমি বলছি তুই দেশলাই নিয়ে আয়'—গলায় তার আদেশের সুর। ভেতরে গিয়ে আন্না দেশলাই নিয়ে আসে। সেগুলো নিয়ে গলির দিকে চলে গেল রোক্কি। আন্না তাকে জিজ্ঞাসা করে—

'আবার চললে কোথায়?'

জবাব এল না। আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল রোক্কি। বারান্দায় এসে বসল আন্না। এ্যাণ্টনী উঠানে আসে। আন্না জিজ্ঞাসা করে—'কে বড়দা?'

'তুই উঠানে এসে দাঁড়িয়েছিস কেন?'

'তোমাদের অপেক্ষায়।'

'রোক্কি এসেছিল?'

'এসেছিল, কিন্তু দেশলাই নিয়ে এখুনি চলে গেল।'

'এখন তার দেশলাইয়ে কি দরকার পড়ল?'

'বলল, বিড়ি জ্বালানোর জন্য চাই।'

'ও তো বিড়ি খায় না।' এ্যাণ্টনী ভাবছিল। জিজ্ঞাসা করল—

'এখানে কি হাওয়া এসেছিল ?'

'না তো।'

কিছু দূরে একটা কি জ্বলে উঠল। আলো যেন ক্রমেই বাড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

'হায়! একেবারে ধোকা দিল।' বুক চাপড়িয়ে এ্যাণ্টনী বলে উঠল।

চিন্তিত আন্নার জিজ্ঞাসা—

'বড়দা, কি ব্যাপার, কি হয়েছে ?'

'ও···কারখানায় আগুন লাগিয়েছে !'

আশপাশে চীৎকার, চেঁচামেচি, কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

সেনাবাহিনীর গাড়ীর আসা যাওয়া, হর্নের আওয়াজ।

গলিতে লোকজনের ছোটাছুটির শব্দ। একটুবাদেই যেন কাদের চেঁচামেচি। সবশেষে একটা করুণ আর্তনাদ।

'আরে ছোড়দা, ছোড়দার চীৎকার'—আন্না গলির দিকে ছুটল।

এ্যাণ্টনী ওকে থামাল। ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে ভালভাবে দরজা বন্ধ করে দিল। পায়ের শব্দ শুনে আন্না বুঝতে পারল এ্যাণ্টনী গলির দিকে দৌড়িয়ে গেল।

যেন হুঙ্কার আর ভীষণ চীৎকার! ক্রমে শব্দ দূরে, আরও দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষে সব শান্ত! চারিদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

আন্না দরজার পাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে। উঠানে পায়ের শব্দ।

আন্না প্রশ্ন করল—

'কে বড়দা ?'

'হুঁ'—গম্ভীর কণ্ঠের উত্তর।

যেন বারান্দায় কেউ উঠে আসে। কে যেন দরজা খোলে। আন্না তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালায়। দরজা খুলে যায়। খাকি পোশাক দেখে আন্না সরে আসে। লোহার মত একটা হাত তার কাঁধ চেপে ধরে। 'ঔঃ'—সজোরে চেঁচিয়ে ওঠে আন্না হঠাৎ লাফ

মেরে কে ঘরে ঢুকল। একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার ও প্রচণ্ড ঘুঁষি। খাকি পোশাকের লোকটি পেছন ফিরে দেখল। রোগা লোকটির ছুরি সমেত হাতটা উপরে উঠে এসেছে। খাকি পোশাকের লোকটি এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিল। ছুরিটা ছিটকে পড়ল। এবার ত্বরিৎ গতিতে সেই লৌহমুষ্টি রোগা লোকটিকে চেপে ধরল। লোঁহার হাতের চাপে সে যেন পিষে যাচ্ছে।

খাকি পোশাকের লোকটি রোগা লোকটিকে দরজা বাঁধবার দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। প্রদীপটা নিভে গেল। দারুণ ভয় পেল আন্না। রোগা লোকটি এক দারুণ চীৎকারে ফেটে পড়ল।

'হায় ভগবান!' করুণস্বরে আর্তনাদ করে উঠল আন্না।

একটা চীৎকার, সাহসিকতার একটু আভাষ।

ঘরের সামনে বাঁশের খুঁটি মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ল। একটা ভেঙ্গে নীচে পড়ল। ঘরের চালটা ভেঙ্গে পড়ল! আবার একটা উগ্র হুঙ্কার।

'হায় ভগবান······।'